দীনবন্ধু মিত্র

*   *   *   *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫০

*   *   *   *

শ্রীসুশীলকুমার দে



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ : মাঘ. ১৩৫৮ সাল

মুদ্রাকর :—শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড আর্ট প্রেস
২৫বি, ছিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলিকাতা—১২

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

নাট্যগতহৃদয়েষু

দীনবন্ধু মিত্র

(১)

উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে মধুসূদন-বঙ্কিমের যুগে যে-সাহিত্য বাঙালীর নবজাগ্রত প্রতিভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, সেই সাহিত্যের ও যুগের অন্যতম ধুরন্ধর ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহাদের কাছে এই শক্তিশালী সাহিত্যস্রষ্টার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রতিকূল আবহাওয়ায় আমরা বিগত যুগের অবজ্ঞাত সাহিত্যের কীর্ত্তিকাহিনী প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। এ-কালের আধুনিকত্ব নাকি এত উন্নত হইয়াছে যে তাহাতে শুধু দীনবন্ধু কেন, তাঁহার সমসাময়িক মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রও নিতান্ত সেকেলে হইয়া গিয়াছেন। তাই বর্ত্তমান সাহিত্যচর্চ্চায় অপরিত্যাজ্য পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের খাতির থাকিলেও, তাঁহাদের রচনা প্রধানতঃ মুরুব্বিয়ানার চালে অথবা পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই আলোচিত হয়; দীনবন্ধুর রচনা অপাঠ্য বা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ রুচিবাগীশমহলে ইহা নাকি একেবারে অস্পৃশ্য। বর্ত্তমান বক্তার রুচি ও সাহিত্যজ্ঞান নিতান্ত সেকেলে, তাই দীনবন্ধুর কথা

বলিবার এই সামান্য চেষ্টা নিশ্চয় যুগবিরোধী ধৃষ্টতা বলিয়া গণ্য হইবে।

কিন্তু এ কথা আমরা আজকাল ভুলিয়া যাই যে, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের মত দীনবন্ধু সেকালের হইলেও চিরকালের বাঙালী। তাঁহারা যুগসন্ধির সময় যে অভিনব সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার প্রেরণা ও আদর্শ ইংরেজী সাহিত্য হইতে আসিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার প্রাণশক্তির মূলে ছিল বাঙালীর নবজাগ্রত জাতীয় চেতনা। বাঙালীর বাঙালীত্ব সুস্থ ও প্রাণবন্ত ছিল বলিয়া নূতন ভাবপ্লাবনের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াও বাঙালী তাহার সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় ভিত্তি লাভ করিয়াছিল। বিদেশী ভাবকল্পনাকে প্রথমে আত্মসাৎ ও পরে আত্মস্থ করিয়া, যাঁহারা প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ছিলেন সে যুগের সাহিত্যস্রষ্টা। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে, বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই, এই প্রাণধারা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, এবং বাঙালীর সাহিত্য বাঙালীর সত্যকার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন জাতির প্রভাব নয়, ব্যক্তি-পুরুষের সর্ব্বগ্রাসী স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বত্র প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। জাতির জীবনের সহিত ব্যক্তির জীবনের সন্ধি এখনও হয় নাই বলিয়া, আজকাল দেখা যায় একপ্রান্তে গীতিকবিতার নিছক ভাবুকতা, সূক্ষ্মতর কল্পনাবিলাস, অথবা বিশ্বজনীন অবাস্তবের বিহ্বল উপাসনা, অন্যপ্রান্তে বিদেশের আঁস্তাকুড় ও স্বদেশের বস্তি ঘাঁটিয়া বিকৃত বাস্তবের কৃত্রিম বিনোদ। তাই এ-যুগের বাঙালী

চিনিতে পারে না দীনবন্ধুকে, যিনি ছিলেন মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালী।

অথচ দীনবন্ধু সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন লিখিয়াছিলেন—"এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে?" সখের থিয়েটারের সামান্য সূচনা হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে নীলদর্পণের অভিনয়ের দ্বারা যাঁহারা ন্যাশনল থিয়েটর নামে বাংলা দেশে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অগ্রগণ্য নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ দীনবন্ধুর উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন—"আপনাকে রঙ্গালয়স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।" এ কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে, কারণ, বর্ত্তমান কালে আমরা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি যে, নাট্যকার ও হাস্যরসিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধুর একটি উচ্চ ও নিজস্ব স্থান আছে, যেখানে তাঁহার সমকক্ষ নাই বলিলেও চলে। সাধারণ লোকে হয়ত দীনবন্ধুর রচনার মর্ম্মগ্রহণ করে, কিন্তু যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত বলিয়া গণ্য তাঁহাদের বিরূপতা দেখিয়া হতাশ হইতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ কোন উচ্চ-উপাধিধারী পণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন—"দীনবন্ধুর হাতে বাঙ্গালা নাটকের কলাকৌশলের কোন উন্নতি হয় নাই…যথার্থ নাট্যকারের প্রতিভা দীনবন্ধুর ছিল না"। আর হাস্যরসিক হিসাবে দীনবন্ধুর নাম উচ্চারণ করাও নাকি পাপ! রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া দীনবন্ধুর নাম না উল্লেখ করিলেও সমকালবর্ত্তী লেখকদের রুচি মার্জ্জিত ছিল না বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। যখন তিনি লিখিয়াছেন—"নির্ম্মল

শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন" —তখন বোধ হয় বঙ্কিমের সুহৃদ্ ও সহযোগী দীনবন্ধুর উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই! যাঁহারা মার্জ্জিত রুচির শুচিবাইগ্রস্ত তাঁহারা হয়ত ইহার সমর্থন করিবেন; কিন্তু স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর রুচিকে অসংযত বা অনির্ম্মল বলিয়া অবহেলার যোগ্য মনে করেন নাই। দীনবন্ধুর রসিকতা ও রুচি সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে তাহা পরে বলিব; কিন্তু এরূপ আপত্তি নূতন ভাবে উত্থাপিত হইলেও একেবারে নূতন নহে কলিকাতা রিভিয়ু পত্রের পুরাতন সংখ্যায় পাদরী লালবিহারী দে যে অসহিষ্ণু ভাষায় দীনবন্ধুর নিন্দা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক রুচিবাগীশদের মন্দ লাগিবে না। অন্যদিকে, সমাজ-রক্ষক স্থিতিশীল সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন সধবার একাদশী নাটকটিকে "আদ্যোপান্ত অশ্লীল বকামি ও মাতলামির কথাতেই পরিপূর্ণ...জঘন্য পদার্থ" বলিয়া অভিহিত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, "তৎপাঠে সমাজের কিছুমাত্র শিক্ষালাভ নাই"! দীনবন্ধুর সৌভাগ্যের কথা, তিনি এরূপ লোকশিক্ষাপ্রয়াসী উপদেষ্টার হাতে না পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মত রসজ্ঞ বন্ধু ও সমালোচক পাইয়াছিলেন; নচেৎ তাঁহাকে 'নীতিপথ' বা 'রোমাবতী উপাখ্যান' লিখিয়া সাহিত্য-জীবন শেষ করিতে হইত!

অবশ্য, গত শতাব্দীতে পাদরী সাহেব বা পণ্ডিত মহাশয় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে কিছু যায় আসে না, এবং লোকে

তাহা অনেক দিন হইল ভুলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু কালচক্র পূর্ণ হইয়া আবার বিশ্বসাহিত্যপরিশীলন-কামী একশ্রেণীর স্বয়ংসিদ্ধ সমালোচকদের মুখে সেই অভিযোগ অতি উৎকট আকারে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের একজন ধুরন্ধর লেখক অজ্ঞতার নিশ্চিন্ত বিজ্ঞতায় লিখিয়াছেন, দীনবন্ধুর রচনাগুলি "suggest that he was obsessed with a sheer love of the lewd and filthy" ! শুধু তাহাই নহে, দীনবন্ধুর নাটকগুলি "grotesque stories of unimaginable crimes and perverse passions", "he only provokes our disgust", এবং তাঁহার "pedantic, artificial and erudite style does not save us from the feeling of nausea produced by the morbid tone of his comedies" ! একাধারে pedantic, artificial, erudite, lewd, filthy, grotesque, perverse, disgusting, nauseating ও morbid—এতগুলি বিচিত্র বিশেষণের অতি-অজ্ঞ বা অতি-দুষ্ট অপবাদ আর কোন বাঙালী লেখকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা জানা নাই। এ কথা সত্য, কাব্য করিবার প্রলোভনে অনেক সময় গুরুতর বিষয়বস্তুতে দীনবন্ধুর ভাব ও ভাষা দীর্ঘায়ত ও আড়ষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু যে মহাপ্রভু দীনবন্ধুর হাস্যরসাত্মক নাটকের রীতি ও ভাষাকে pedantic, artificial ও erudite বলেন, তাঁহার সরস্বতীর মাতৃভাষা বোধ হয় বিভিন্ন। আর বাকি কয়টি

বিশেষণ অতি-আধুনিক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকের পক্ষে অপূর্ব্ব বটে!

তাই মনে হয়, বর্ত্তমান কালে দীনবন্ধু-প্রসঙ্গ অবান্তর হইলেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। দীনবন্ধুর প্রতিভা আপন গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠ; কৈফিয়ত দিবার কিছুই নাই, কিন্তু আলোচনা ও পরিচয়ের প্রয়োজন রহিয়াছে। অবশ্য যাঁহারা বাঙালী হইয়াও বাঙালীকে বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা এই বাঙালীত্বে বিশ্বাসী নিতান্ত বাঙালী নাট্যরসিকের রীতি ও রসিকতা উপভোগ করিতে পারিবেন না; তাঁহাদের জন্য দীনবন্ধু-প্রসঙ্গ নয়। রুচিবাগীশেরাও চোখ বুজিয়া কান ঢাকিয়া থাকুন, আপত্তি নাই। কিন্তু যাঁহারা নূতন কাল্‌চার-বিলাসী আদব-কায়দায়, চাপা হাসি ও মাপা কথার কৃত্রিম সৌজন্যে এখনও আত্মবিস্মৃত হন নাই, তাঁহারাও গত যুগের জীবন ও জগতের বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। সেইজন্য, বাংলা দেশের সংস্কৃতির উপর গত যুগের বাংলা সাহিত্য কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে প্রথমেই একটু ভূমিকার প্রয়োজন। যদিও সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সৃষ্টির মত দীনবন্ধুর সৃষ্টিরও একটি চিরন্তন মূল্য আছে, যাহা ইতিহাসগত নয়, যাহা দেশ ও কালের উর্দ্ধে অবস্থিত, তথাপি দীনবন্ধুর অপূর্ব্ব রসকল্পনা রূপলাভ করিয়াছিল একটি বিশিষ্ট যুগের ও জীবনের পরিবেষ্টনীর মধ্যে। তাঁহার একান্ত বাস্তব-সচেতন ভাবনা বিশ্ব জগতের উর্দ্ধ আকাশে বৃন্তহীন পুষ্পের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে

নাই; তাহা বিকাশলাভ করিয়াছিল বাঙালীর সমতল মনোভূমিতে, তাহার মূল ছিল বাংলাদেশ ও কালের রসচেতনার মধ্যে বহুবিস্তৃত।

আপনারা জানেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে আসিয়াছিল বাংলার জীবনে ও সাহিত্যে একটি নব যুগ! এ যুগের সূচনা হইয়াছিল বহুপূর্ব্বে—যখন রাষ্ট্রশাসনের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে, অর্থাৎ দীনবন্ধুর আবির্ভাবেব অব্যবহিত পূর্ব্বেই, বাঙালীর সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যে, ধর্ম্ম প্রথা ও চরিত্রে যে-বিপ্লব দেখা দিয়াছিল, তাহার মূল কারণ ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই বিপরীতধর্ম্মী সভ্যতার সংঘর্ষ ও মর্ম্মগত বিরোধ। ইংরেজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু এই বিপ্লবের গতিবেগ বর্দ্ধিত করিয়াছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার। হিন্দু কলেজ নামে হিন্দু হইলেও ভাবে গৌরবে ও শিক্ষাপদ্ধতিতে অহিন্দু মনোবৃত্তির প্রশ্রয়ের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার পাঠ্যতালিকায় প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্যচর্চ্চার নামগন্ধও ছিল না। নব্যবঙ্গের মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্ত্তনেব জন্য যে আপাত-মনোহর কৌশল মেকলে সাহেব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার পরিপোষক হইয়াছিল জাতীয় সংস্কৃতির সহিত সম্পর্ক-বিহীন এই শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সুতরাং সম্পূর্ণ বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে, বিশেষতঃ ১৮২৬

হইতে ১৮৩১ সাল পর্য্যন্ত, এই কলেজের যুক্তিবাদী তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর প্রেরণায়, সে-যুগের শিক্ষিত নব্যবঙ্গের ভাব-জীবন নানা সমস্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহাই একমাত্র ঘটনা ছিল না। যে সকল আন্দোলন তখন প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত, অথচ বিচ্ছিন্ন, ভাবধারা এই বিক্ষোভকে আরও জটিল ও তুমুল করিয়া তুলিয়াছিল। একদিকে ছিল ডিরোজিও-প্রবর্ত্তিত নূতন শিক্ষায় উদ্ধত হিন্দুকলেজের ছাত্রবৃন্দ, যাঁহারা প্রাচীন ভাব ধর্ম্ম ও সমাজ অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের সত্যের বন্ধু ও মিথ্যার শত্রু বলিয়া পরিচয় দিতেন। অন্যদিকে ছিল প্রথমে সাধারণ ভাবে রামমোহন রায়ের ও পরে বিশিষ্ট ভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুগামী সম্প্রদায়, যাহারা প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারপন্থী ও যুক্তির দ্বারা ধর্ম্মসমন্বয়প্রয়াসী। এই দুই দলেরই বিরোধী ছিল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ধর্ম্মসভা, যাহার অগ্রগামী ছিলেন রাধাকান্ত দেব ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং যাহার চেষ্টা ছিল যাহা কিছু প্রাচীন তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরা। সুতরাং একদিকে নূতনের উপর সীমাহীন ও অবিবেকী নির্ভরতা, অন্যদিকে পুরাতনের উপর অন্ধ ও দৃঢ়মূল বিশ্বাস,—এই দুই অন্তরায়ের মধ্যে পড়িয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রকৃত সমন্বয় প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সে-যুগের নব্যবঙ্গের চিন্তাধারা ও কর্ম্মজীবন যে এই দোটানার মধ্যে পড়িয়া, নোঙ্গরছেঁড়া নৌকার মত বিপথচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল তাহা

কিছুই বিচিত্র নয়। স্বয়ং ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী বুদ্ধিতে বিশ্বাসী হইলেও, হিন্দু-কলেজী দলের চরম মনোবৃত্তি ও আচরণ রামমোহন রায় সমর্থন করিতেন না ; অন্যদিকে একেশ্বর ব্রহ্মে বিশ্বাস, পৌত্তলিকতা-বিদ্বেষ প্রভৃতি মতবাদ তাঁহাকে গোঁড়া হিন্দু সমাজের বিরোধী ও খ্রীষ্টান পাদরী সমাজের পক্ষপাতী করিয়াছিল। সুতরাং নব্যবঙ্গের চিত্তচাঞ্চল্যের সুযোগ লইয়া, প্রবীণ ও প্রতিপত্তিশালী রামমোহনের সাহায্যে, গোলদীঘি ও হেদুয়া-পুষ্করিণী সংলগ্ন হিন্দু পল্লীতে আস্তানা গাড়িলেন পাদরী ডফ (Duff) ও ডিয়াল্ট্রি (Dealtry), যাঁহাদের সকল কর্ম্মের প্রেরণা ছিল গোঁড়া খ্রীষ্টান মিশনরীর মনোভাব। ইহা উল্লেখযোগ্য, যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তেমনি খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিও নব্যবঙ্গের বিরোধিতা ছিল স্পষ্ট ; তথাপি প্রথমে (১৮৩২) ডফের প্রভাবে হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং পরে (১৮৪৩) ডিয়াল্ট্রির প্ররোচনায় মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙালীর ভাব-জীবনে যে বিক্ষোভ জাগিয়াছিল, তাহা সাধারণ বিক্ষোভ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যে যুগ-সন্ধি বা মন্বন্তর ঘটিয়াছিল, তাহা ছিল মুখ্যতঃ রাষ্ট্রীয় শাসন-পরিবর্ত্তনের ফল। কিন্তু ইহার পরেই ইংরেজী শিক্ষার প্রচারে যে-ভাববিপ্লব ঘটিল, তাহা কেবল রাষ্ট্রীয় সমস্যা নয়, তাহাতে সমাজের গভীরতম চেতনা ও ব্যক্তির অন্তরতম অনুভূতি

উৎক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই ভাবে যখন নূতন যুগান্তকারী আদর্শ ও শিক্ষা বাঙালীর জড়ত্বপ্রাপ্ত বুদ্ধিকে আঘাত করিল, তখন দিশাহারা হইলেও বাঙালী যুবক তাহার প্রাণধর্ম্ম একেবারে হারাইয়া ফেলে নাই। উগ্রপন্থী নব্যবঙ্গের উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনার যে সব কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল হিন্দু কলেজের একতরফা শিক্ষাপদ্ধতি; কিন্তু নূতন আলোকের প্রখরতা তাহাদের চক্ষু ধাঁধিয়া দিলেও প্রাণের প্রাচুর্য্য নষ্ট করে নাই। তাই নূতন পথে যাত্রার ব্যাকুলতা ছিল দুর্ব্বার, বন্ধনছেদের অধীরতা ছিল উদ্দাম। নূতন উৎসাহে পুরাতনের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবার সময় বা আগ্রহ তাহাদের ছিল না। দেশের সনাতন আদর্শ তখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন, প্রাচীন সাহিত্যের গুরুত্ব অজ্ঞাত ও অগোচর; সুতরাং বিদেশের আদর্শ ও বিদেশের সাহিত্যই ছিল নিশ্চিন্ত অবলম্বন। আত্মধর্ম্মের সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে পরধর্ম্মের প্রত্যক্ষ সত্য যে নবচিন্তার আগ্রহ ও নবশক্তির উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাতে বুঝা যায়, দিগ্‌ভ্রান্ত হইলেও নব্যবঙ্গের প্রাণশক্তি ছিল অক্ষুণ্ণ।

সে-যুগে এরূপ বিক্ষোভের প্রয়োজনও ছিল। হয়ত বাহির হইতে আঘাত ও প্রেরণা না আসিলে আমরা আত্মশক্তির পরিচয়ও পাইতাম না। এই ধাক্কা প্রথমে লাগিয়াছিল শিক্ষার আদর্শে, পরে ভাব ও চিন্তার সংস্কারে, সমাজ-জীবনের বন্ধন-গ্রন্থিতে ও চিরাচরিত ধর্ম্মবিশ্বাসের মর্ম্মমূলে। গতানুগতিকতার

মোহভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু তখনও পূর্ণ জাগরণ হয় নাই, অর্থাৎ যুগের সকল প্রভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; তাই সদ্যঃপ্রবুদ্ধ আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দেখা যায় তীব্র অসন্তোষ, অন্ধ অসহিষ্ণুতা, বাদ-প্রতিবাদ, বিদ্রোহ। আধ্যাত্মিক সঙ্কটে কেহ সমাজ-সংরক্ষণ, কেহ সমাজ-সংস্কার; কেহ ধর্ম্মান্তরগ্রহণ, কেহ পুরাতন ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যান; কেহ অন্ধ বিশ্বাস, কেহ বা নিছক নাস্তিকের মনোভাব—এইরূপ নানা লোকে নানা পন্থা অবলম্বন করিল। চারিদিকেই দেখা দিয়াছিল পথ খুঁজিয়া লইবার উৎকণ্ঠা। শিক্ষা সমাজ সাহিত্য ধর্ম্ম, সকল ক্ষেত্রেই প্রকট হইয়াছিল সংস্কারের প্রবল ঝোঁক,—কেবল ইংরেজী বিদ্যার প্রেরণায় নয়, ইংরেজী বুদ্ধির প্রয়োগে। এই যুগে যাঁহারা সাহিত্য-রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন—রামমোহন, ভবানীচরণ, কৃষ্ণমোহন, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ—তাঁহারা আমাদের চির-স্মরণীয় পথপ্রদর্শক। কিন্তু সংস্কারমনস্কতার যুগে তাঁহারা ছিলেন মুখ্যতঃ সংস্কারক, যুগ-মনীষার নির্দ্দেশক; যদি সাহিত্য-সৃষ্টি কিছু হইয়া থাকে তাহা আনুষঙ্গিক ফলমাত্র। অনুকরণ ও উপকরণ-সংগ্রহ, অথবা প্রয়োগ-পরীক্ষা ও অভ্যাস হিসাবে প্রশংসার্হ হইলেও, সাহিত্য তখনও নূতন শিল্পাগারে শিক্ষার্থী।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ যেমন একটি বিদ্রোহের যুগ, তেমনি ইহার উত্তরার্দ্ধ ছিল প্রতিষ্ঠার যুগ। প্রথম আলোড়ন-বিলোড়ন শান্ত হইবার পর বাহিরের সহিত সন্ধি করিয়া অন্তরে যে-আদর্শ গৃহীত হইল, তাহার ফলে এখন বাংলা সাহিত্যে

বাঙালীর ভাব-জীবন এক অপূর্ব্ব রসরূপ লাভ করিল। ইতি-মধ্যে বিজাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির যুগোপযোগী সমন্বয়ে আমরা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে পাইয়াছিলাম দৃঢ়ভিত্তির আশ্বাস। তাই সংস্কার-বাসনার সঙ্গে আসিল সাহিত্য-সৃষ্টির আনন্দ; যুক্তিতর্ক বিচারবুদ্ধির যে প্রয়োজন তাহার বাহিরে, সকল প্রয়োজনের অতীত ভাবকল্পনার উল্লাস নব্যবঙ্গের প্রাণমন অধিকার করিল। ডিরোজিওর মত শিক্ষকের প্রেরণায় এখন আর পুস্তকগত জ্ঞানের আস্ফালন নয়, ডি. এল. রিচার্ডসনের মত সাহিত্যরসজ্ঞ অধ্যাপকের প্রভাবে আসিল ইংরেজী সাহিত্যের সহিত বৃহত্তর ও ঘনিষ্ঠতর পরিচয়। এই সাহিত্যের অন্তহীন ঐশ্বর্য্য ও বৈচিত্র্য নব্যবঙ্গের সুপ্ত সাহিত্যিক প্রতিভাকে উজ্জীবিত করিল,—কেবল অনুকরণের জন্য নয়, উপকরণ সংগ্রহের জন্য নয়, তাহার মর্ম্মটি প্রাণের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করিয়া তাহার সমগ্র রসরূপটি বাংলা ভাষায় প্রতিফলিত করিবার জন্য। ইহাই ছিল মধুসূদন-বঙ্কিম-দীনবন্ধু-বিহারিলাল যুগের অভিনব বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব।

নূতন ভাব ও চিন্তা যখন সত্যই আত্মস্থ হইল, তখন ইহার প্রভাবে বাঙালীর জাতীয় চেতনা বহুকালের জড়তা হইতে নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। পাশ্চাত্য আদর্শের উপর যেমন অপরিসীম বিশ্বাস ছিল, তেমনি প্রবল হইয়া উঠিল দেশীয় আদর্শের প্রতি মমতা ও তাহাকে রক্ষা করিবার আগ্রহ। নবভাবপ্লাবন যখন সমাহিত হইল, তখন স্বজাতি ও স্বদেশকে

আঁকড়াইয়া ধরিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য সত্যকার ব্যাকুলতা ও সুনিশ্চিত প্রয়াস সে-যুগের সাহিত্যস্রষ্টাদের অনুপ্রেরিত করিল। একদিকে ইংরেজী শিক্ষা, অন্যদিকে বাঙালীর জাতি-ধর্ম্ম,—এই দুইয়ের মর্ম্মগত বিরোধ থাকিলেও অবশেষে সন্ধি বা সমন্বয় সম্ভবপর হইয়াছিল, কারণ, পাশ্চাত্য আদর্শের মূলেও ছিল একটি সুপ্রাচীন ও সুপরীক্ষিত সত্য। এই সত্যের মূলমন্ত্র হইতেছে—যাহাকে ইংরেজীতে বলে humanism, কিন্তু যাহা আমাদের দেশীয় সংস্কারের বহির্ভূত বলিয়া উপযুক্ত প্রতি-শব্দ দিয়া প্রকাশ করা যায় না। এই আদর্শের লক্ষ্য হইতেছে মানুষের মনুষ্যত্ববোধ, তাহার জীবনগত পরম রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সুস্থ সহজ জীবন-প্রীতি। পারলৌকিকতা নয়, ইহ-লৌকিকতা; দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন নয়, মানুষের মধ্যেই দেবতার অনুসন্ধান; অমরত্বের 'অদৃষ্ট' লীলায় ও উৎকর্ষে নয়, মরজীবনের প্রত্যক্ষ সম্ভাব্যতায় ও মহিমায় বিশ্বাস,—এই সাত্ত্বিক ভাবের ভানমুক্ত নিতান্ত রাজসিক নূতন জীবন-দর্শন, বা মানবধর্ম্মবাদ, গতানুগতিক চিন্তাপদ্ধতির বিরোধী ছিল, কিন্তু বাঙালীত্বের বা বাঙালী মানুষের স্বভাবধর্ম্মের প্রতিকূল ছিল না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই নব মানবীয় আদর্শের উদারতা ও তাহার অন্তর্গত মর্ত্যপ্রীতি নবযুগের ভিত্তিস্থাপনের সময় হইতেই আমাদের জীবনে কর্ম্মে ও সাহিত্যে নূতন প্রেরণা আনিল। আমাদের স্বধর্ম্মনিহিত সনাতন আদর্শটি তৎকালে সংশয়াচ্ছন্ন ছিল, পরধর্ম্মের প্রত্যক্ষ সত্য তাহার উদ্ধার করিতে

যথেষ্ট সহায়তা করিল। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের নূতনতর ব্যাখ্যা এইরূপ প্রয়াসের ফল; এবং সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথার নিরোধ প্রভৃতি আন্দোলন এই নূতন মনোভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিল। সাহিত্যেও এই সব আদর্শ অপূর্ব্ব বস্তুদৃষ্টি ও ভাবকল্পনায় নানা রূপে ও ভঙ্গীতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের আচারে সংস্কারে ও শিক্ষায় বর্দ্ধিত হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনে ও কর্ম্মে এই মানবধর্ম্মবাদী যুগপ্রকৃতিরই বিকাশ দেখাইয়াছেন। বাহিরে সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইলেও, ভিতরে এই স্বজাতি-বৎসল কর্ম্মতৎপর তেজস্বী পুরুষটি ছিলেন মানুষের মনুষ্যত্বে ও পুরুষের পৌরুষে বিশ্বাসী, প্রত্যক্ষবাদী, খাঁটি আধুনিক। মধুসূদনের মনোবৃত্তিতে হয়ত কিছু গ্রীক pagan ভাব ছিল, কিন্তু তাঁহার কাব্যপ্রেরণার মূলে ইলিয়দের গ্রীক অথবা প্যারাডাইস্ লষ্টের পিউরিটান্ মনোভাব ছিল না। তাঁহার কাব্যের বাহিরের রূপটি ছিল ক্লাসিকাল, কিন্তু প্রাণবস্তু ছিল রোমান্টিক আবেগ। তাঁহার কবি-মানসের একদিকে ছিল নবযুগের ভাবজগৎ ও নব মানবতার আদর্শ, অন্যদিকে ছিল বাঙালীর সংস্কারগত একান্ত সুকুমার ভাবপ্রবণতা। ইহার ফলে মধুসূদন যাহা রচনা করিলেন তাহা ঠিক প্রাচীন মহাকাব্য হইল না, মহাকাব্যের আকারে বাঙালী মানসের প্রতিচ্ছবিমূলক আধুনিক বাংলা কাব্য। তাই তাঁহার কাব্যে 'Ravan is a good fellow', এবং তাঁহার

অঙ্কিত রাম-লক্ষ্মণ, রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের সন্ততি নয়, হোমর-মিল্‌টনের সন্ততির সগোত্রও নয়। কিন্তু যে শক্তির স্ফূর্ত্তি ও সংস্কারমুক্তির আনন্দ বাংলা সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ খাতে সমুদ্র-কল্লোল আনিয়াছিল, নির্জ্জীব পয়ারকে সঞ্জীবিত ও পক্ষ-মুক্ত করিয়া মহাকাব্যের আকাশে ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেই দুর্দ্ধর্ষ প্রাণের আবেগ, নব আদর্শে ও নব সৃষ্টির সাহসে ও বৈচিত্র্যে, সর্ব্বপ্রথম কবিকল্পনার মুক্তির পথ দেখাইয়া দিল। তথাপি, যে মনুষ্য-প্রীতি সে-যুগের সাহিত্যের মূলকথা ও ইহার কল্পনা-স্ফূর্ত্তির মূল প্রেরণা ছিল, তাহা পরিপূর্ণ রসরূপ লাভ করিল বঙ্কিমচন্দ্রে। অপরূপ রূপবৈচিত্র্যে তিনি দেখাইলেন, মানুষের দেহ-মন-প্রাণের যে বিরাট ও অতলস্পর্শী রহস্য, তাহার ভোগের ও ত্যাগের, সৃষ্টির ও ধ্বংসের যে অন্তর্লীন শক্তি আছে, তাহা সত্যই অন্তহীন বিস্ময় ও শ্রদ্ধার বিষয়। এই যে "দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন", ইহাই মানুষের স্বাভাবিক অধিকার ; সর্ব্ববিধ বাধা ও বন্ধন, ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা, পাপ ও পুণ্য মানুষের এই জন্মগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। উপন্যাস ছাড়িয়া দিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের যে ধর্ম্মতত্ত্ব, তাহারও প্রধান লক্ষ্য ছিল মনুষ্যের মনুষ্যত্ব-সাধন। তিনি নিজেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন ঃ "মনুষ্য-জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাই না।" ইহাই ছিল নবযুগের ও নবসাহিত্যের মানবীয় সাধনার প্রাণধর্ম্ম। দীনবন্ধুর নাটকে-প্রহসনে যে অপূর্ব্ব চিত্তপ্রসন্নতা ও রসসৃষ্টি রহিয়াছে তাহাও

এই অকৃত্রিম জীবন-প্রীতির অপর একটি বিকাশ। প্রতিদিনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনাগুলির মধ্যে যে সহজ রস রহিয়াছে, যাহা এককালে মুখে হাসি ও চোখে জল লইয়া আসে, যাহা কেবল জীবনরস-রসিকেরই দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তাহাই দীনবন্ধুর অনুভূতি ও সমবেদনায় নূতন করিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে, এই সময়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের রস ও রুচি অতিশয় জীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। যে রচনার রীতি ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা কেমন করিয়া নবযুগের নবজাগ্রত রস-পিপাসাকে তৃপ্ত করিবে? বিশাল ও বিচিত্র ইউরোপীয় সাহিত্যে অভ্যস্ত শিক্ষিত সমাজ তাহাতে আমোদ পাইলেও তাহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিল না। কাব্যরসের পরিবর্ত্তে যে-রসের পরিবেশন চলিতেছিল, তাহাতে ছিল সমসাময়িক ঘটনা, ব্যক্তি বা সমাজকে লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। ইহাই ছিল বঙ্কিম-দীনবন্ধুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ঈশ্বর গুপ্তের যুগ, যখন নব শিক্ষার সংঘাতে নানা বাস্তব-সমস্যার সম্মুখীন হইয়া সংক্ষুব্ধ বাঙালীর মনে ভাবকল্পনার অবসর ছিল না। আসন্ন পরিবর্ত্তনের আশঙ্কায় নূতনকে উপহাস ও পুরাতনকে ধরিয়া রাখিবার যে ব্যাকুলতা, তাহা ছিল সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারের আগ্রহের বিরুদ্ধে সমাজ-সংরক্ষণের চেষ্টার অনুরূপ। এই স্থিতিশীল মনোভাবই ছিল ঈশ্বর গুপ্তের তৎকালীন প্রতিষ্ঠার কারণ। কিন্তু প্রাচীন আদর্শের শেষ কবি হইলেও, তিনি

ছিলেন যুগসন্ধির কবি; তাই তাঁহার মধ্যে নূতন আদর্শেরও কয়েকটি সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। কবিত্বশক্তি থাক্ বা না থাক্, তাঁহার ব্যঙ্গকবিতার বিষয়বস্তু ছিল মুখ্যতঃ সাধারণ মানুষ —'রঙ্গভরা বঙ্গদেশে'র সাধারণ বাঙালী। দেবদেবীর মাহাত্ম্য নয়, কোন অসাধারণ ঘটনা বা চরিত্র নয়, 'পৌষপার্ব্বণ', 'তপসে মাছ', 'পাঁঠা', 'বড়দিন' প্রভৃতি দৈনন্দিন বাঙালী জীবনের অকিঞ্চিৎকর বস্তু বা ব্যাপার সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয়ের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। নিছক দেবদেবীর মাহাত্ম্য তাঁহার পূর্ব্বগামী ভারতচন্দ্রকেও মুগ্ধ করিতে পারে নাই, কিন্তু ভারতচন্দ্র ধর্ম্মের আবরণটি বজায় রাখিয়াছিলেন। এই আবরণের আড়ালে শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ ও তাঁহাদের দাম্পত্য কলহের যে সরস চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তাহাতে মহাযোগী শিব বা মহীয়সী পার্ব্বতীর পরিবর্ত্তে পাইতেছি গঞ্জিকাসেবী বৃদ্ধ দরিদ্র কুৎসিত পতি ও তাহার সুন্দরী তরুণী মুখরা ভার্য্যার বিসদৃশ মিলনের ও হাস্যকর গার্হস্থ্য জীবনের নিত্যদৃষ্ট বাস্তব-রূপ! ইহাতে দেবচরিত্রের দুর্গতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানুষের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রে এই স্বল্প সূচনার পর যুগপরিবর্ত্তনের আরও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় কবি-টপ্পা-যাত্রা-পাঁচালী-রচয়িতাদের প্রায় একশতাব্দীব্যাপী অধুনা অবজ্ঞাত রচনার মধ্যে। ইহা খুব উঁচুদরের সাহিত্য ছিল না; শিল্প-রূপ ছিল অতি সামান্য; গানগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, বৈষ্ণবগীতির সূক্ষ্মতাও নাই। কিন্তু খুব স্থূল হইলেও এই রচয়িতাদের মন ছিল

সাধারণ মানুষের মন। ইহাদের ছড়ায় ছিল দৈনন্দিন জীবনের সরস অভিজ্ঞতা; ইহাদের প্রেম ছিল সাধারণ মানুষের প্রেম; ইহাদের আগমনী গানে ছিল বাঙালীর সহজ বাৎসল্যের স্বাভাবিক আকুলতা। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যখন এই পুরাতন সাহিত্যের জের টানিতেছিলেন, তখন আকাশে বাতাসে নবযুগের নব আদর্শ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; সুতরাং তাঁহাকে আর ধর্ম্মের ঠাট বজায় রাখিতে হয় নাই, তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপের মধ্যে সাধারণ মানুষের কথাই সাধারণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

যে খাঁটি বাংলা রীতি ও ভঙ্গীতে ঈশ্বর গুপ্ত (গদ্য নয়) পদ্য লিখিয়াছিলেন, তাহাও তিনি ভারতচন্দ্রের সময় হইতে প্রচলিত এই দেশীয় সাহিত্যের ধারার মধ্যে পাইয়াছিলেন; এবং তাঁহার রসবোধও আসিয়াছিল এই পথ দিয়া। কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাষা ছিল সহজ ও স্বচ্ছ, অথচ সুমার্জ্জিত ও গাঢ়বদ্ধ। ইহার নিপুণ প্রকাশভঙ্গীতে যে শিক্ষিত রসবোধ ও বিদ্বৎসুলভ বৈদগ্ধ্য রহিয়াছে, তাহাতে ইহার বিশুদ্ধ স্বল্পাক্ষর রীতিকে বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিকাল রীতির প্রথম উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভাষার এ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না; হইলে হয়ত পরবর্ত্তী কালের ভাষা-সমস্যার অতি সহজ ও সুন্দর সমাধান হইত। কেবল রাষ্ট্রীয় গোলযোগ বা সামাজিক অব্যবস্থা ইহার কারণ নয়। যে-ভাববিপ্লব তৎকালের শিক্ষিত মনোভাবকে পাশ্চাত্যাভিমুখী করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে আসিল প্রথমে মিশনরী, পণ্ডিত ও মুন্‌শীদের নূতন করিয়া ভাষাসৃষ্টির

প্রয়াস, এবং পরে ইংরেজী ভাবপ্রকাশের জন্য ইংরেজী ধরণের ভঙ্গী ও রীতির প্রয়োজন। তথাপি, একটা সামঞ্জস্য অসম্ভব ছিল না। কিন্তু অন্তরায় হইয়াছিল প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী ভারতচন্দ্রের অক্ষম ও কদর্য্য অনুকরণ, যাহাতে শিক্ষিত সমাজের মন ভারতচন্দ্রের প্রতি নিতান্ত বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই পরবর্ত্তী ভাষার আদর্শে ভারতচন্দ্রের বাণীভঙ্গী টিকিতে পারিল না।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে যে-গদ্যসৃষ্টির প্রয়াস চলিতেছিল, তাহা কেবল নূতন প্রয়োজনের জন্য নূতন গদ্যরীতির উদ্ভাবনা নয়, বাংলা ভাষার জন্মান্তর-প্রাপ্তির সাধনা। কিন্তু ইহার প্রসূতিকাল ছিল দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী ; এবং তাহার উৎকট ক্লেশের পরিচয় পাওয়া যাইবে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশ-কাল পর্য্যন্ত তৎকালীন বিবিধ গদ্যলেখকের বিবিধ ধরণের গদ্যরীতির প্রয়াসের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, ১৮৫৯-৬০ সাল বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়, কারণ ইহা নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থল ; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অস্তমিত ও মধুসূদন দত্ত নবোদিত। ঈশ্বর গুপ্তের তিরোধান হইয়াছিল ১৮৫৯ সালে। মধুসূদনের তিলোত্তমা ১৮৬০ সালে, মেঘনাদ ও ব্রজাঙ্গনা ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে আর একটি যে তৎকালে-অখ্যাত বিজনবাসী কবি লিরিক-ভাবুকতার সাধনা করিতেছিলেন, সেই বিহারিলালের স্বপ্নদর্শন ও সঙ্গীতশতক প্রকাশিত হইয়া-ছিল ক্রমান্বয়ে ১৮৫৮ ও ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং, ১৮৫৮

হইতে ১৮৬২ সালের মধ্যে মধুসূদন ও বিহারিলাল এই দুই কবির যুগান্তকারী প্রতিভায় বাংলা কাব্যের ভাষার যে দিক্-নির্ণয় হইয়া গিয়াছিল, তাহা ভারতচন্দ্রের বা ঈশ্বর গুপ্তের রীতির অনুস্মৃতি নয়, কিন্তু তাহাই নিত্যবর্দ্ধনশীল সৌকুমার্য্যে মাধুর্য্যে ও নমনীয়তায় অবশেষে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আসিয়া বিচিত্র পরিণতি লাভ করিল। কিন্তু ১৮৫৮ হইতে ১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত গদ্য-রচনার ভাষা কি অবস্থায় ছিল? এই সময়ের মধ্যে যে সকল সুপরিচিত রচনায় বিভিন্ন ধরণের গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়, তাহাদের প্রকাশকাল এইরূপ:

১৮৫৮ সাল—প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল, রামনারায়ণের রত্নাবলী, কালীপ্রসন্ন সিংহের সাবিত্রী-সত্যবান।

১৮৫৯ সাল—মধুসূদনের শর্ম্মিষ্ঠা, প্যারীচাঁদের মদ খাওয়া বড় দায় ও কালীপ্রসন্নের মালতীমাধব।

১৮৬০ সাল—বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, রাজেন্দ্রলালের শিল্পিক দর্শন, মধুসূদনের পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

১৮৬২ সাল—কালীপ্রসন্নের হুতোম প্যাঁচার নক্শা ১ম ভাগ।

এই সন-তারিখ ও রচনাগুলির উল্লেখ হইতে বুঝা যাইবে যে, ১৮৫৮ হইতে ১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত সাধারণ গদ্যরীতির নিশ্চয়তা

ছিল না। গদ্যসাহিত্যের ভাষা তখনও নিজস্ব ভঙ্গী ও রূপ লাভ করিতে পারে নাই। একদিকে ছিল নিতান্ত অসাধু সাধুভাষার জের, অন্যদিকে নিতান্ত অচল চল্‌তি ভাষার প্রচার। এই দুই বিপরীতগামী প্রবৃত্তির ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া দীনবন্ধুর আবির্ভাবের সময় বাংলা গদ্যের সমস্যা সত্যই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু ভাষার মধ্য দিয়াই সাহিত্য আপন রূপ গ্রহণ করে। যখন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল, তখন বাংলা ভাষার সুপ্ত প্রকাশ-শক্তি প্রায় অগোচর। কি পদ্যে, কি গদ্যে, ভাষার অপরিসীম দারিদ্র্য নবযুগের কল্পনাকে নৈরাশ্যে অভিভূত করিয়াছিল। তাই তাহার নূতন প্রয়াস তখনও শিল্পসঙ্গত পূর্ণরূপ লাভ করিতে পারে নাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা ছিল, কি করিয়া বাংলা ভাষাকে ইংরেজীর মত স্বাধীন সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও উৎকৃষ্ট শিল্পকলার উপযুক্ত করিয়া তোলা যায়। অর্থাৎ, ইংরেজী সাহিত্যের শুধু বহিরঙ্গ আকৃতি নয়, অন্তর্গত প্রাণটিকেও, বিজাতীয়তা হইতে মুক্ত করিয়া, বাংলা সাহিত্যের নির্জ্জীব দেহে সংক্রামিত করা যায়। সে-সময় অনেকেই, রঙ্গলালের মত, পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রাণের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার গূঢ় মর্ম্মটি প্রতিফলিত করিতে পারেন নাই। বাংলা ভাষার তৎকালীন অবস্থায় এরূপ চেষ্টা দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হইয়া-ছিল। কিন্তু কেবল অনুকরণ নয়, উপকরণ-সংগ্রহ নয়, শিল্প-কৌশল নয়,—পাশ্চাত্য সাহিত্যের অপূর্ব্ব কল্পনাভঙ্গী ও বিচিত্র

ভাবমাধুর্য্য, ভাষার অপরিমেয় শক্তি ও ছন্দের অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য— এক কথায়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমগ্র রূপ ও রসটি বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করিতে না পারিলে কেমন করিয়া তাহার নবজীবন লাভ হইবে? বাংলা কাব্যে মধুসূদনের দুর্দ্দমনীয় প্রতিভার দুঃসাহস সর্ব্বপ্রথম এই সমস্যা-সমাধানের সন্ধান দিল। কিছু পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাহিত ভাবকল্পনা নিত্য-নূতন রূপসৃষ্টির মধ্য দিয়া নূতন যুগের সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণতর সৌন্দর্য্যে বিকশিত করিয়া তুলিল।

সুতরাং, ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আপন সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসই ছিল নবযুগের একটি প্রধান লক্ষণ। পাশ্চাত্য শক্তির প্রবল পীড়নে বাঙালীর সুপ্ত শক্তি গুমরিয়া উঠিল। প্রকাশের বেদনা আছে, ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু ভাষা নাই, ছন্দ নাই। বাস্তব অনুভূতির ক্ষেত্রে যে বস্তুর পরিচয় নাই, তাহাকে ভাবকল্পনায় বরণ করিলেও সাহিত্যসৃষ্টিতে ধারণ করিবার উপযুক্ত আধার ছিল না। কিন্তু জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে নব বিস্ময় ও শ্রদ্ধাবোধ প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই প্রেরণায় চালিত হইয়া জাতীয় ভাব রূপ ও রসের ভিতরই এই আধার খুঁজিয়া পাইলেন সে-যুগের সাহিত্যস্রষ্টারা। বাহিরের আক্রমণ অন্তরের প্রেরণাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, তাই বিদেশী আদর্শ গ্রহণ করিলেও দেশের আলো-জল-বায়ু ও জাতির নিজস্ব চেতনা হইতেই তাঁহারা সাহিত্য-সৃষ্টির রস সংগ্রহ করিলেন। এ বিষয়ে দীনবন্ধুর কৃতিত্ব কিছু কম ছিল না;

কারণ নবযুগের যে-প্রেরণা মধুসূদনের স্বচ্ছন্দ ছন্দকাব্যে ও বঙ্কিমের শিল্পকুশল গদ্যকাব্যে সার্থক হইয়াছিল, তাহাই অন্য-দিক দিয়া দীনবন্ধুর বাস্তবধর্ম্মী নাটক-প্রহসনের রসসৃষ্টি করিয়াছিল। মধুসূদন আনিলেন সর্ব্বসংস্কার-বন্ধন হইতে কবিকল্পনার জড়তামুক্তি, ভাব ভাষা ও ছন্দের আবেগ ও অবারিত প্রবাহ। তখন একদিকে, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জীবনের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখকে লোকোত্তর কল্পনার উচ্চক্ষেত্রে তুলিয়া ধরিয়া রোমান্সের সৃষ্টি করিয়া বাঙালীর ভাবচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। অন্যদিকে, দীনবন্ধু বাঙালীর যে সহজ ভাবভঙ্গী ও তীক্ষ্ণ রস-বুদ্ধি তাহাকেই নিত্যপ্রবহমান জীবনধারার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া বাঙালীর বাঙালিয়ানাকে নানা সরস ভঙ্গিমায় রূপায়িত করিলেন।

প্রাচীন কাল হইতে বাংলাদেশের কাব্য ছিল গীতিধর্ম্মী, কিন্তু ইহার লোকসাহিত্যের অন্তরালে যে বাস্তবধর্ম্মী সহজ রসিকতা ছিল, তাহাও বাঙালীর জাতিগত প্রবণতা। বাংলার মঙ্গলকাব্যে, কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রে, অসংখ্য ছড়া ও প্রবচনের মধ্যে বাঙালীর যে-রসচেতনা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, নবযুগের প্রাক্-কালে তাহার জের চলিয়াছিল, সাহিত্যের রাজপথ দিয়া নয়, কবি-যাত্রা-পাঁচালীকারদের অশিক্ষিত রচনা ও ঈশ্বর গুপ্তের অমার্জ্জিত ব্যঙ্গবিদ্রূপের অধঃপথ দিয়া। তখন পর্য্যন্ত কেবল এই রসবুদ্ধির দ্বারা উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু সে সম্ভাবনা চিরকালই ছিল। কারণ, বাঙালীর প্রকৃতি যেমন

একদিকে ছিল গীতিপ্রাণ ও কল্পনাপ্রবণ, তেমনি অন্যদিকে ছিল দৈনন্দিন জীবন-রসের রসিক। বাঙালীর এই উৎকৃষ্ট রস-সন্ধানী মানসধর্ম্মের মধ্যেই নিহিত ছিল তাহার খাঁটি বাঙালীত্ব, যাহা তাহার নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতির যুগলব্ধ ফল। এই সহজ রসিকতাকেই দীনবন্ধু সাহিত্যসৃষ্টিতে সার্থক করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহার সহজাত রসদৃষ্টি ও নাট্যপ্রতিভার নূতন সামর্থ্যে।

(২)

বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু প্রধানতঃ হাস্যরসের রচয়িতা বলিয়া পরিচিত, এবং অফুরন্ত হাস্যরসে তাঁহার ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়; কিন্তু তাঁহার সর্ব্বপ্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) হাস্যোদ্রেকের জন্য রচিত হয় নাই। যে সাময়িক উত্তেজনা ও উদ্দেশ্য এই নাটকটিকে প্রেরিত করিয়াছিল, তাহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাহা ছিল ইহার উপকরণ ও উপলক্ষ্য মাত্র। 'নীলদর্পণ' কেবল নীলকরদের সাময়িক উৎপীড়নের কাহিনী নয়; ইহার মধ্যে বাংলার দীনদুঃখীর প্রাত্যহিক পল্লী-জীবনের যে নিখুঁত ও করুণ চিত্র বাস্তব-অনুভূতি ও সমবেদনায় অঙ্কিত হইয়াছে, এবং তাহার দ্বারা যে সনাতন জীবন-সত্য

জীবন্ত ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, কেবল তাহারই একটি চিরন্তন সাহিত্যিক মূল্য আছে। এই জীবন ও জীবন-সত্যের মধ্যে দীনবন্ধু যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাহার ভাব-ভঙ্গী, এমন কি ভাষাটি পর্য্যন্ত, যে ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাট্যপ্রতিভার অসামান্যতাই প্রথম সূচিত হইয়াছিল। কেবল সাময়িক আন্দোলন যদি ইহার প্রতিপত্তির একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে ইহা সমকালীন সাহিত্যিকদের রসগ্রাহিতা লাভ করিতে পারিত না; এবং সেই আন্দোলন প্রশমিত হইবার পরও ইহার সাহিত্যিক খ্যাতি অক্ষুণ্ণ থাকিত না। সমসাময়িক মধুসূদনও স্বয়ং নাটক রচনা করিয়াছিলেন এবং নাটকের মর্ম্ম বুঝিতেন; তিনি যে কেবল হুজুগের বশে এই নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ করিয়া বিপদের সম্ভাবনায় পড়িবেন, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না। নাটকটি প্রকাশিত হইবার বার বৎসর পরে, এবং অন্য কারণে নয় কেবল নাটক হিসাবে, বাংলা দেশের প্রথম জাতীয় রঙ্গমঞ্চ ইহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল নাট্যশালার প্রথম অভিনয় ও উদ্বোধনের জন্য। বিষয়ের সাময়িক অভিনবত্বের উপর কোন-কোন নাটকের সাফল্য নির্ভর করিতে পারে, কিন্তু এরূপ আকস্মিক সাফল্যের দ্বারা তাহার স্থায়ী মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না। সে-যুগে সামাজিক ও রাজনীতিক অনিষ্ট সংশোধনের জন্য অনেকগুলি নাটক রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার একটিও নীলদর্পণের মত স্মরণীয় হইতে পারে নাই। তাহার কারণ, এই সব রচনাতে অঙ্কিত চরিত্রগুলি উদ্দেশ্য-সৃষ্টি

না করিয়া উদ্দেশ্যই চরিত্র-সৃষ্টি করে। ইহা সত্য, সাময়িক জীবনের কোন নিদারুণ দুঃখ দীনবন্ধুর প্রাণমন আলোড়িত করিয়া তাঁহার উন্মেষোন্মুখ প্রতিভাকে প্রেরিত করিয়াছিল; এই বিশিষ্ট উদ্দেশ্যের কথা তিনি নিজেই ভূমিকাতে লিখিয়াছেন। কিন্তু যে আত্মনির্লিপ্ত বাস্তব-তন্ময়তা শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য তাহাই তাঁহাকে উদ্দেশ্য-বিহ্বলতার দোষ হইতে মুক্ত করিয়াছে। তাই তিনি রক্তমাংসের মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার দ্বারা নাটকের অন্তর্গত উদ্দেশ্য আপনা-আপনি পরিস্ফুট হইয়াছে, কেবল উদ্দেশ্যের খাতিরে তিনি কতকগুলি দোষ বা গুণের অতিরঞ্জিত প্রতীক চিত্রিত করেন নাই। অর্থাৎ তিনি নাটক লিখিয়াছেন, নাটকের ছলে উদ্দেশ্যমূলক প্রবন্ধ রচনা করেন নাই। প্রথম চেষ্টা হইলেও নীলদর্পণ দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার পূর্ণাঙ্গ না হোক্, সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে; ত্রুটি রহিয়াছে, কিন্তু কৃতিত্ব আছে যথেষ্ট। তাই ইহার বিদ্যমান অসম্পূর্ণতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উভয়ই আমাদের আলোচনার যোগ্য।

কিন্তু আধুনিক কালে এরূপ আলোচনার অসুবিধা রহিয়াছে। বর্ত্তমান ভাবপ্রধান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে সত্যকার নাটক বা নাটকীয় প্রেরণা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। গীতিকবিতার সূক্ষ্মতর রসবিলাস ছাড়িয়া দিলে, কথাসাহিত্যই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই নাট্যসাহিত্য ও কথাসাহিত্যের পার্থক্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত অস্পষ্ট যে, নাটক বলিতে আমরা বুঝি অঙ্ক দৃশ্য ও সংলাপে বিভক্ত

রোমান্স বা সমস্যামূলক উপন্যাস জাতীয় রচনা, অথবা নিছক ভাবুকতার অরূপ রূপক, যাহাতে ঘটনাবিন্যাস বা চরিত্রসৃষ্টির বালাই নাই। কিন্তু এই ধরণের আধুনিক রচনা দৃশ্য নয়, পাঠ্য; অভিনেয় নয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য। ইহাকে বুঝাইতে যদি পৃথক শ্রেণী বা সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু ইহাকে নাটক বলিলে নাটক-শব্দের যে মর্ম্মগত অর্থ তাহার অপলাপ করা হয়।

কারণ, এই অর্থ কেবল সাহিত্যিক প্রথার সঙ্কেত বা convention নয়, ইহা একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক রসরূপেরও নির্দ্দেশ করে, যাহার তাৎপর্য্য বর্ত্তমান কালের সাহিত্যপদ্ধতির অনুকূল না হইলেও সর্ব্বকালের সাহিত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপন্যাস ও নাটক উভয়েরই উপাদান হইতেছে মানুষের জীবন-লীলার বৈচিত্র্য; কিন্তু একটিতে এই জীবনলীলা বর্ণনীয়, অন্যটিতে দর্শনীয়। তাই উপন্যাসে বিবৃতি, বিস্তৃতি, ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে; কিন্তু যাহা ঘটিতেছে তাহার প্রবাহিত রূপ, ঘটনাগত অবস্থায় ও চরিত্রগত বাক্যে-কার্য্যে, প্রত্যক্ষের মত প্রদর্শন করাই নাটকের বৈশিষ্ট্য। নাট্যকার যে কেবল স্বয়ং আড়ালে থাকেন তাহা নহে, দর্শিত ঘটনা বা চরিত্র সম্বন্ধে তিনি যেন অনাসক্ত; নিজের মতামতের প্রভাব তাহাদের গতিকে চালিত বা বিঘ্নিত করে না। উপন্যাসে গ্রন্থকারের আড়ালে থাকিবার প্রয়োজন নাই; তিনি যখন কথক তখন তাঁহার স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ, তাঁহার অভিজ্ঞতা ও কল্পনা

কথিত কাহিনীকে নিজস্ব ভাবে ফুটাইয়া তোলে। কিন্তু সৃষ্টির রঙ্গালয়ে যে বৃহত্তর জীবন-নাট্যের অভিনয় নিত্যই চলিতেছে, তাহারই একটি অংশ নূতন করিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে নির্লিপ্তভাবে উপস্থাপিত করাই নাট্যকারের কৃতিত্ব। হয়ত বিষয়বস্তুর সমগ্র পরিকল্পনায় অথবা চরিত্রগুলির মৌলিক আদর্শে নাট্যকারের আপন উপলব্ধির পরিচয় থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার আত্মবিলোপ করিবার ক্ষমতা যতই অধিক ততই তাঁহার নাট্যচিত্রের ঔজ্জ্বল্য ও সাফল্য। যাহা নাটকে ঘটিতেছে, তাহা কেহ ঘটাইতেছে না, আপনার ভঙ্গীতে ও নিয়মে যেন আপনি ঘটিতেছে,—নাট্যকারের নিরপেক্ষ নির্ম্মাণ-নিপুণতা এইরূপ একটি বিভ্রমের সৃষ্টি করে। ঘটনার দৈবরূপ ও অন্তরের নিয়তিরূপ যে শক্তি, তাহার অনিবার্য্যতার মধ্যে যে নাট্যকারের সজ্ঞান চেষ্টা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জীবনের যাহা কিছু প্রত্যক্ষ অনুভূতির গোচর তাহাকে, আত্মগত ভাবনায় নয়, এইরূপ বস্তুগত স্বাভাবিকতায় দর্শনীয় করিবার যে আবেগ, তাহাতেই নাট্যরসের সৃষ্টি।

সুতরাং নাট্যপ্রতিভার মূলে রহিয়াছে নাট্যকারের আত্মবিমুখ ও বাস্তবোন্মুখ তন্ময়তা, যাহাতে অন্তরের ভাবুকতার ব্যতিরেকেই বাহিরের বস্তুসত্তা আপন মহিমায় প্রত্যক্ষের রসরূপে মূর্ত্তিমান হয়। উপন্যাসেও বস্তুধর্ম্মিতা আছে; কিন্তু তাহা একান্ত বস্তুগত নয়, ঔপন্যাসিকের অন্তরবাহী ভাবকল্পনা হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত ও নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী নয়। অর্থাৎ, নাটকে

কল্পনার যে নিছক objectivity বা বস্তু-তাদাত্ম্য নিতান্ত আবশ্যক, উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতিতে তাহা অপেক্ষিত নয়। • প্রাচীনকাল হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বর্গের সাহিত্যরসজ্ঞেরা নাটকের দৃশ্যত্ব বা অভিনেয়ত্বকে ইহার প্রাচীন লক্ষণ বলিয়া ধরিয়াছেন। এই লক্ষণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে ইহার বস্তুমাত্রৈকনিষ্ঠতার লক্ষণ, যাহা ইহাকে পৃথক করিয়াছে অন্যবিধ সাহিত্য-রচনা হইতে। অভিনেয়ার্থ বলিয়া যে কেবল নাটকের বহিরঙ্গ রূপ ও নির্ম্মাণকৌশল বিভিন্ন হইয়াছে তাহা নয়, ইহার অন্তরঙ্গ রস ও অনুভূতির প্রকারও বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। কেবল পাঠ্য নয় বলিয়া নিপুণ অভিনয়ের দ্বারা নাটকের চাক্ষুষ প্রয়োগ ও উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। যদি অভিনয়ের সুবিধা না থাকে, তবে পড়িবার সময় ইহার ঘটনা-পরম্পরা ও চরিত্র-চিত্রগুলিকে কষ্ট করিয়া কল্পনার সাহায্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ না করিলে ইহার মর্ম্মগ্রহণ করা যায় না। কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, বর্ত্তমান কালে এত কষ্ট স্বীকার করিবার সময় বা উৎসাহ আমাদের নাই। উপন্যাসে এ সবের বালাই নাই; সব কথাই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত বা ব্যাখ্যাত হয়। সুতরাং, বর্ত্তমান দৈহিক ব্যস্ততা ও মানসিক অলসতার যুগে নাটকের চেয়ে উপন্যাস যে লোকপ্রিয় তাহা খুবই স্বাভাবিক।

তাহা ছাড়া, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিপুরুষের প্রতিষ্ঠা হইতেছে বর্ত্তমান যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ। শিক্ষায় সমাজে সাহিত্যে সর্ব্বত্র একটি অতিমাত্রায় আত্মসচেতন, আত্মাভিমানী ও আত্মকেন্দ্রিক

মনোভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যাহা আপনাকে ছাড়া বিশ্ব-জগতে আর কোন মানুষ দেখিতে পায় না। তাই যাহা যেমন তাহাকে আমরা তেমন করিয়া দেখি না; তাহার স্বকীয় মাধুর্য্য দিয়া নয়, আমাদের আপন মনের মাধুর্য্য দিয়া তাহাকে রচনা করি; এবং আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়াই তাহাকে প্রকাশ করি। নাট্যকল্পনায় যে বাস্তবমুখিতা অপরিহার্য্য, এই অহং-তান্ত্রিক মনোভাব তাহার বিরোধী; কারণ বস্তুরসসাধনা নয়, আত্মযোগভাবনাই ইহার মূলমন্ত্র। ইহার ফলে, কাব্যে উপন্যাসে নাটকে সর্ব্বত্র আত্মগত ভাব ও ভাবনার বিস্তারে বহুবিধ সমস্যা নানা আকারে প্রাধান্য লাভ করিতেছে। সেইজন্য বর্ত্তমান কালের নাটকে জীবন এখন দৃশ্য বা অভিনেয় নয়, স্বার্থগত সমস্যার জটিলতায় ইহার স্বতঃউৎসারিত প্রবাহ যেন বুদ্ধির ঘূর্ণিপাকের মধ্যে প্রতিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই নাটক এখন দৃশ্য নয়, উপন্যাসের মত বুদ্ধিগ্রাহ্য; ইহা মানব-জীবনের চলন্ত চিত্র নয়, ভাবকল্পনার পাকে প্রস্তুত কতকগুলি ism বা মতবাদের প্রচার-প্রপঞ্চ। মানুষ যখন আছে, তখন তাহার সমস্যাও আছে: কিন্তু সমস্যার চেয়ে জীবন বড়। পরিকল্পিত সমস্যা-শেমুষীর নয়, যথাপ্রাপ্ত জীবনের যে রস, নাট্যকার সেই রসের রসিক।

এ সব কথা এত করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আধুনিক কালের সমালোচনায় গতযুগের নাট্যসাহিত্য ও নাট্য-কারদের সম্বন্ধে যে সব দায়িত্বহীন মন্তব্য দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, বস্তুগত সাদৃশ্য থাকিলেও নাটক ও উপন্যাসের রূপগত

ও রসগত পার্থক্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান ধারণা যেন অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডক্টর-সমালোচক দীনবন্ধুর নাটকে কোন সমস্যা নাই বলিয়া আক্ষেপ করেন, অথবা যথার্থ "নাট্যকারের প্রতিভা দীনবন্ধুর ছিল না" বলিয়া মন্তব্য করেন, তখন বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু তিনি আরও বলিয়াছেন, দীনবন্ধুর নাকি "সুপ্ত ঔপন্যাসিক প্রতিভা" ছিল ; কেবল উপন্যাসের ধারা তখন প্রচলিত হয় নাই বলিয়া, "জনসাধারণের কাছে অধিকতর সুপরিচিত" নাট্যরচনার পদ্ধতি তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল ; "বিশেষ করিয়া মধুসূদনের প্রহসন দুইটি" নাকি দীনবন্ধুর "পথনির্দ্দেশ" করিয়াছিল।

দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা ছিল কিনা তাহার সবিস্তর আলোচনা আমরা পরে করিব ; কিন্তু তাঁহার যে ঔপন্যাসিক প্রতিভা ছিল না, তাহার সাক্ষ্য দিতেছে তাঁহার দুইটি গল্প রচনার ব্যর্থ চেষ্টা। কিন্তু এই বিচিত্র মন্তব্যের মধ্যে কেবল সত্যের নয়, তথ্যেরও অপলাপ রহিয়াছে। দীনবন্ধুর নীলদর্পণের প্রকাশকাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ; ওই একই সালে মধুসূদনের উল্লিখিত প্রহসন দুইটিও প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং এগুলি দীনবন্ধুর পরবর্ত্তী কালের বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬) ও সধবার একাদশীর (১৮৬৬) আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার নাটক রচনার পথপ্রদর্শক নয়। নীলদর্পণের অব্যবহিত পূর্ব্বে কেবল মধুসূদনের শর্ম্মিষ্ঠা ১৮৫৯ সালে ৩রা সেপ্টেম্বরে অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পদ্মাবতী ১৮৬০ সালে সমকালবর্ত্তী, এবং কৃষ্ণকুমারী এক বৎসর

পরে ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এ কথা সত্য, কালীপ্রসন্ন সিংহের সংস্কৃত হইতে রূপান্তরিত নাটকগুলি কিছু পূর্ব্বে ১৮৫৭ হইতে ১৮৫৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই অধুনাবিস্মৃত কৃত্রিম রচনাগুলি ছাড়িয়া দিলে, উল্লেখ-যোগ্য হইতেছে রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী ও কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব, যাহা যথাক্রমে ১৮৫৪ ও ১৮৫৮ সালে অভিনীত হইয়াছিল, যদিও তাঁহার নবনাটক প্রকাশিত হইয়াছিল অনেক পরে ১৮৬৬ সালে। কালীপ্রসন্ন ও রামনারায়ণের রচনাগুলি লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠার প্রস্তাবনায় আক্ষেপ করিয়াছিলেন—

"অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

সুতরাং নাট্যরচনার পদ্ধতি তৎকালে পরিচিত হইলেও এরূপ আদৃত হয় নাই যে কেবল তাহাই দীনবন্ধুর প্রেরণা যোগাইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। ১৮৫৬-৫৭ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস অথবা ১৮৫৮ সালে টেকচাঁদ-প্রকাশিত আলালের ঘরের দুলাল যদি তখনও উপন্যাসের ধারা প্রবর্ত্তিত করিতে পারে নাই, তাহা হইলে এ কথাও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না যে, নাটক-রচনার পথও উল্লিখিত অপরিণত রচনাগুলির দ্বারা তৎকালে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

নাটক-রচনায় দীনবন্ধুর পূর্ব্বগামী ছিল না, এ কথা বলিতেছি

না, কিন্তু যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা তখনও বাংলা নাটককে তাহার সাহিত্য-রূপ দিতে পারেন নাই। বাংলা নাটকও আধুনিক যুগের সৃষ্টি; ইহার উৎপত্তি ও বিকাশ হইতেছে বাংলা সাহিত্যের উপর ইংরেজী সাহিত্যের বহুমুখী প্রভাবের অন্যতম ফল। এমন কি রামনারায়ণের মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও লিখিতেছেন যে, তিনি ইংরেজী নাটকের "অতুলনীয় রসমাধুরী"তে মুগ্ধ এবং ইংরেজী আদর্শই তাঁহার অবলম্বন। কিন্তু তাঁহার কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব বা নবনাটক কৌতুককর সমাজচিত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য হইলেও প্রকৃত নাটকের গৌরব লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রহসনগুলিও যৎসামান্য ও বৈচিত্র্যহীন। এরূপ 'অলীক কুনাট্যরঙ্গ' দেখিয়া মধুসূদনও নাটকরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে নাট্যকলার সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্য ও নবতর সাহিত্য-সৃষ্টির দুর্ব্বার কৌতূহল ছিল, কিন্তু দীনবন্ধুর তুলনায় মধুসূদনের মানস-প্রকৃতি নাটকের উপযোগী ছিল না। তাই তাঁহার নাটকগুলিতে শক্তির পরিচয় থাকিলেও প্রতিভার প্রকাশ নাই। অবশ্য প্রহসন দুইটি ব্যর্থ হয় নাই; কিন্তু বাস্তবজীবনের সহিত বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে তাঁহার অন্য নাটকগুলি পুস্তকগত আদর্শের কৃত্রিমতা-দোষ এড়াইতে পারে নাই।

বাঙালীর জীবন ও জগতের সহিত এই বিস্তৃত ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং তাহাকে নাটকের আলেখ্য-পটে প্রতিফলিত করিবার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ছিল বলিয়াই দীনবন্ধুর নাটকগুলি বাংলা

সাহিত্যে প্রথম সার্থক রচনা হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বে বাংলা নাটক ছিল না বলিলেই হয়। তাঁহার রচনাতেও অপরিণত যুগের অসম্পূর্ণতা যথেষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু হাস্যরসের যে অপূর্ব্ব প্রেরণা ও আত্মভাবনিরপেক্ষ বাস্তবচেতনা তাঁহার নাট্যচিত্রগুলিকে সরস ও জীবন্ত করিয়াছে, তাহা প্রকৃত নাট্যরসিকের উপযুক্ত। বঙ্কিমের মত রোমান্সে বা দুর্লভ কবিত্বে দীনবন্ধুর দক্ষতা ছিল না, কিন্তু দেশ-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বাঙালী জীবনের বিশিষ্ট রূপটি বোধ হয় আর কাহারো রচনায় এরূপ সুস্পষ্ট ভাবে মর্ম্মস্পর্শী হয় নাই।

এ কথা সত্য, মানুষের জীবনে যাহা চিরন্তন তাহাই সাহিত্যের উপাদান ; কিন্তু যাহা চিরকালের তাহা দেশ-কালের পরিধির মধ্যেই প্রকাশ পায়। মানুষ হইলেও বাঙালী বাঙালী,—এই বিশিষ্ট বাঙালীত্বের মধ্যেই দীনবন্ধু সনাতন মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এ সন্ধান না জানিলে যেমন প্রকৃত বাংলা নাটক লেখা যায় না, তেমনি প্রকৃত বাংলা নাটকের রসগ্রহণও করা যায় না। দীনবন্ধু নিজে প্রাণে-মনে খাটি বাঙালী ছিলেন ; তাই দোষভরা গুণভরা, হাসিভরা কান্নাভরা বাঙালীকে তিনি বুঝিতেন, এবং তাহার জীবনের সঙ্গে তাঁহার সংযোগ ছিল আন্তরিক। খাঁটি বাঙালী অর্থে এই বুঝায়, বিদেশী প্রভাব সত্ত্বেও তাঁহার মানস-প্রকৃতি ছিল বাঙালীর নিজস্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি দিয়া গঠিত ; প্রকাশভঙ্গী ছিল বাঙালীর নিজস্ব পদ্ধতি ; ভাষাটিও ছিল বাঙালীর দৈনন্দিন

সহজ ভাষা, যাহা কেবল অভিজাত সমাজে নয়, মাঠে-ঘাটে হাটে-বাজারে অন্তঃপুরেও বোধগম্য। এ ভাষা ভঙ্গী ও মনোভাব আজকাল আমরা জানি না বা মানি না, কারণ বিশ্বসাহিত্য ও বিশ্বমানবের সন্ধানে নিজের সাহিত্য ও জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া, আমরা কাল্‌চার-মার্জ্জিত কৃত্রিম মনোবৃত্তিতে বিজাতীয়, অথবা নির্ব্বিশেষ বিশ্বাত্মতায় নির্জাতীয় হইয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করি।

দীনবন্ধু এরূপ বিশ্বজনীন ভাবলোকে বিচরণ করেন নাই; নিতান্ত নিকটে ও চারিপার্শ্বে যে বহির্জ্জগৎ ছিল, তাহারই দিকে তিনি সমস্ত মনটি উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বাস্তব-মুখী চেতনা হইতে আসিয়াছিল প্রত্যক্ষ বিষয়ের সহিত নিবিড় সহানুভূতি, সকল শ্রেণীর ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ভাব ভঙ্গী ও ভাষাটি পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিবার অপূর্ব্ব শক্তি এবং নাটকের জীবন্ত প্রবাহে নির্লিপ্তভাবে প্রতিফলিত করিবার আশ্চর্য্য লিপি-কৌশল। ইহার জন্য যে যে উপাদানের প্রয়োজন তাহারও অভাব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন: "কি উপাদান লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই।" কার্য্যোপলক্ষে দীনবন্ধুকে নানা স্থানে যাইতে হইত; তিনি সুরসিক ও সদালাপী ছিলেন এবং সকলের

সহিত মিশিতে পারিতেন। তাই বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা ও বহু মানুষ সম্বন্ধে তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছিল, এবং বহু স্থানের প্রাদেশিক ভাষা, এমন কি ওড়িয়া পর্য্যন্ত, তিনি নিখুঁত ভাবে বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। কিন্তু ইহাই সব নয়। বাঙালীসুলভ প্রীতিকল্পনায় তিনি যেমন বাহিরের সহিত অন্তরকে যুক্ত করিতে পারিতেন, তেমনি তাঁহার সহজাত রসবোধ এবং অনুভূত বিষয়ের মধ্যে আত্মবিলোপ করিবার শক্তি ছিল শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের উপযুক্ত। ইহাই তাঁহার বাঙালী জীবনের সংবেদনাময় প্রতিচ্ছবিকে এত সরস ও সুন্দর করিয়াছে।

ইহার প্রথম নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই নীলদর্পণে। তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, রাইচরণ, সাধুচরণ, পদী, আদুরী, আমীন, গোপীনাথ, রাইয়ত প্রভৃতি নিত্যদৃষ্ট, এমন কি অকিঞ্চিৎকর, পল্লীচরিত্রে কাব্যকল্পনা নাই, উচ্চ ভাবচিন্তার অবকাশ নাই। এখানে অতি সহজ ও সুস্পষ্ট চাষার বুদ্ধি, চাষার প্রাণ ও চাষার ভাষা উৎকৃষ্ট নাট্যরসের উপাদান হইয়াছে; কারণ, নাট্যকার পল্লীজীবনের দৈন্য ও দুর্দ্দশা, তুচ্ছতা ও অক্ষমতা, ক্ষুদ্রতা ও হীনতার অন্তর্লোকে প্রবেশ করিয়া, আসল মানুষের মহিমময় রূপটিকে, তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া, স্বভাবসঙ্গত ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া প্রতিবিম্বিত করিয়াছেন। উল্লিখিত চরিত্রগুলির প্রত্যেকটি সুচিন্তিত ও সুপ্রত্যক্ষ; ভাবগত ও ভাষাগত অতিদোষ নাই বলিলেও চলে। বরং গ্রাম্যলোকের কথাবার্ত্তায় চালচলনে যে

অসংজ্ঞাত কৌতুকরসের উপাদান থাকে, তাহা ঘটনার নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসতার উপর প্রলেপের কাজ করিয়াছে। অতি দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়; তাই উড সাহেবের সবুট পদাঘাতের পরও পাষণ্ড গোপীনাথের হাসি পাইল, ও গা ঝাড়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল—'বাপ্! বেটা যেন আমার কলেজ আউট বাবুদের গৌনপরা মাগ'। আমীনের করুণাস্পর্শহীন বজ্জাতির অন্ত নাই; কিন্তু কর্ম্মের খাতিরে সাহেবের লাথি হজম করিলেও, আপন দুষ্কর্ম্মের হৃদয়-হীনতা সম্বন্ধে গোপীনাথ যথেষ্ট সচেতন; তাই তাহার অন্তরের খেদ তাহার রসিকতায় আরও করুণ হইয়াছে। প্রথম রাইয়তের মূক পশুর সহিষ্ণুতা আছে, কিন্তু নিজের ভালমন্দ সম্বন্ধে সে একেবারে নির্ব্বোধ নয়। দেহে অসীম শক্তি ও ধৈর্য্য থাকিলেও সে চতুর; তাই বড় বাবুর নুন খাইয়াও শেষ পর্য্যন্ত শ্যামচাঁদের ঠ্যালায় তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া শ্রেয়স্কর মনে করিল। কিন্তু উড সাহেব তাহার বুকের উপর দাঁড়াইয়া যে বুটের খোঁচা দিয়াছিল তাহা ভুলিতে পারে নাই। তবুও তাহার উল্লেখ করিয়া, ক্ষতের উপর হাত বুলাইয়া, শুধু এইটুকু গালি দিয়া সান্ত্বনা পাইল—'গোড়ার (গুওটার) পা য্যান বল্‌দে গরুর খুর'। দ্বিতীয় রাইয়ত নির্ব্বোধ ও সরল, তাই বিজ্ঞের মত সঙ্গীকে বুঝাইয়া দিল যে বলদে গরুর খুর নয়—'প্যারেকের খোঁচা,—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতা পরে জানিস্ নে'।

তোরাপ ইহাদের মত নিরক্ষর কৃষক হইলেও একান্ত প্রভুভক্ত। মারিয়া ফেলিলেও সে মিথ্যা বলিতে পারিবে না। তাই সে বলিয়া উঠিল—'ঝে বড় বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বসতি কত্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হাল গরু বেঁচেয়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষি দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপকে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পারবো না,—জান কবুল'। তোরাপের শরীরে যেমন অপরিমিত শক্তি, মনে তেমনই অকপট সারল্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু ক্রোধ। এই ক্রোধ দুর্দ্দমনীয় হইলেও বালকের ক্রোধের মত অসহায়; তাই তাহার গোঁয়ারতুমি দেখিয়া যেমন হাসি পায় তেমনি দুঃখও হয়। তবুও তাহার নিতান্ত সাদাসিদে বন্য বলিষ্ঠতার প্রতি শ্রদ্ধারও উদ্রেক হয়। ক্ষেত্রমণিকে উড সাহেবের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া সাহেবকে বাগে পাইয়া পরম সন্তোষের সহিত কানমলা চপেটাঘাত ও হাঁটুর গুঁতা দিতে দিতে তোরাপ বলিল—'ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেম্নি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেমনি হাতের পোঁচা!...ডাকবি তো জোরার বাড়ি যাবি...পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেধের, পাঁচ দিন খাবালি, এক দিন খা'। ভূপতিত নবীনমাধবের উপর ছোট সাহেব তলোয়ারের কোপ মারিলে তোরাপ অসম সাহসে হাত বাড়াইয়া বাঁচাইতে যায়। তাহাতে তাহার হাত উড়িয়া গেছে বলিয়া দুঃখ নাই; কেবল কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিল—'আল্লা! বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে, মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম

না'। কিন্তু প্রতিশোধ হিসাবে তোরাপ জ্বালার চোটে সাহেবের নাক কামড়াইয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছিল; তবুও তাহার আক্ষেপ গেল না—'বড়বাবু যদি আপনি পালাতি পাত্তেন সমিন্দির কান দুটো মুই ছিঁড়ে আনতাম,—খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না'। প্রত্যেকটি কথায় ও কাজে তোরাপের যে অতিগ্রাম্য অথচ অতিসহজ পৌরুষ-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাংলা নাট্যসাহিত্যে সত্যই একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

যেমন গ্রাম্য পুরুষ-চরিত্রে তেমনি গ্রাম্য নারী-চরিত্রেও অল্প কথায় ও কাজে সমগ্র মূর্ত্তিটি প্রতিভাত করিবার নাট্যপ্রতিভা নীলদর্পণে দেখা যায়। পদী ময়রাণী নিজেই বলিয়াছে, তাহার জাতও গিয়াছে, ধর্ম্মও গিয়াছে। আগে সে ছিল রোগ সাহেবের উপপত্নী, এখন তাহার কুট্টিনী, এবং পথে-ঘাটে লাঠিয়ালদের সঙ্গেও রসিকতায় অভ্যস্ত স্বৈরিণী। তবুও সে নিজের অপরাধের জ্ঞান রাখে ও মানী লোকের মর্য্যাদা বোঝে। কচি কচি মেয়েদের সাহেবের হাতে ধরিয়া দিয়া যে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা হয় তাহা সে খুবই জানে। 'আহা ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়, উপপতি করেছি বলে কি আমার শরীরে দয়া নেই'—এ কথাও তাহার মুখে শোনা যায়। আবার, পথে হঠাৎ নবীনমাধবের সম্মুখে পড়িয়া ঘোমটা টানিয়া তাহার মত স্বচ্ছন্দচারিণীও বলে—'ওমা কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম'। অথচ ক্ষেত্রমণির ধর্ষণদৃশ্যে সাহায্য করিল না বলিয়া যখন রোগ সাহেব তাহাকে

ড্যামনেড হোর ও হারামজাদী বলিয়া গালি দিল, তখন সে সাহেবকে উপ-সপত্নীগত ঈর্ষার নির্লজ্জতায় খোঁটা দিতে ছাড়িল না—'তোমার কলিকে ডাকো সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝেছি'। তেমনই আদুরীর ভাবে ও ভাষায় গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ-ঘরের গ্রাম্যা বর্ষীয়সী দাসীর সহজ প্রগল্‌ভতা ও কৌতুকপ্রিয়তা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে। সতীত্বের বড়াই তাহার নাই, তবুও ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেব তাহার কুঠিতে যাইতে বলিয়াছে শুনিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সে তাহার সাহেব-জুগুপ্সা অপূর্ব্ব গ্রাম্য ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে—'থু থু থু! গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো! সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু থু! প্যাঁজির গোন্দো!' ইহার সহিত একমাত্র তুলনীয় মধুসূদনের বৃদ্ধ-লম্পট যবন-যুবতী-লোলুপ ভণ্ড হিন্দু ভক্তপ্রসাদের উক্তি—'মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্‌ভক্ ক'রে বেরোয় তা মনে হলে বমি আসে'!

কিন্তু তোরাপের পুরুষ-চরিত্রের মত ক্ষেত্রমণির স্ত্রী-চরিত্রই হইয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। এরূপ কাব্যকল্পনা-বর্জ্জিত ও নিছক নাটকীয় বাস্তবচেতনায় অঙ্কিত চাষার মেয়ের ছবি, যাহা সরল গ্রাম্য ও অমার্জ্জিত, অথচ একদিকে অসহায় নারীপ্রকৃতির করুণ কোমলতায় ও অন্যদিকে সহজ নারীত্বের আন্তরিক দৃঢ়তায় অপূর্ব্ব, তাহা বাংলা সাহিত্যে সত্যই অতুলনীয়। ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে একটি অতি অশ্লীল অথচ

অতি নিষ্ঠুর বীভৎস দৃশ্যে। পদী ময়রাণী যখন কৌশলে ভয়ত্রস্তা ক্ষেত্রমণিকে রোগ সাহেবের শয়নকক্ষে রাখিয়া প্রস্থান করিল এবং সাহেব তাহার হাত ধরিয়া টানিল, তখন অসহায় বালিকা নিতান্ত কাতরভাবে বলিল—'ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ও সাহেব! তুমি মোর বাবা, ছেড়ে দাও…হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও, তুমি মোর বাবা'। সাহেব নিজেরই উপযুক্ত অশ্লীল রসিকতা করিয়া বলিল—'তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে; আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না। বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব'। গর্ভবতী ক্ষেত্রমণি, শুধু ধর্ম্মরক্ষার ব্যাকুলতায় নয়, আসন্ন মাতৃত্বের স্বাভাবিক সংস্কারে, সাহেবকে দোহাই দিয়া বলিল—'মোর ছেলে মরে যাবে—দই সাহেব—মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতি'। কিন্তু সাহেব না শুনিয়া তাহার কাপড় কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল, এবং অবাধ্যতার জন্য ইন্‌ফারনাল বিচ্ বলিয়া গালি দিয়া বেত্রাঘাত করিল। তখন তীব্র বেদনায় ও নিষ্ফল আক্রোশে আক্রমণকারীকে নিরুপায় গ্রাম্য নারী আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া চীৎকার করিয়া তাহার স্বাভাবিক গ্রাম্য ভাষায় গালি দিল—'ও গুখেগোর বেটা, আঁটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী যোড়া মড়া মর্‌য়্যে। মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি তোর হাত আমি এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো-টুকরো করবো। তোর মা বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়য়ে রইলি কেন, ও ভাইভাতারীর ভাই, মার্‌না মোর প্রাণ বার কর্‌য়্যে ফ্যাল

না, আর যে মুই সইতে পারি না'। তখন সাহেব 'চুপরাও হারামজাদী' বলিয়া তাহার পেটে ঘুসি মারিল, ক্ষেত্রমণি কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

দৃশ্যটি যেমন গ্রাম্য ও পাশবিক তেমনি যে-কোন নাট্যকারের পক্ষে দুরূহ ও সাহসিক। দুরূহ ও সাহসিক, কেন না ভাব ও ভাষার একটু এদিক ওদিক হইলেই এই অতি-সত্য ও অতি-স্পষ্ট দৃশ্য কদর্য্যতার হাত হইতে রক্ষা পাইত না। ইহার গ্রাম্যতা ও নিষ্ঠুরতাকে স্বাভাবিক ভাষায় ও ভাবে রঙ্গমঞ্চে পরিদৃশ্যমান করা যেমন সাহসের তেমনি নিপুণতার পরিচয়স্থল। রুচি-বাগীশেরা এ দৃশ্য অনুমোদন করিবেন না, কিন্তু ইহার পরম সত্যটি অশ্লীলতার নয়, আশ্চর্য্য নাট্যপ্রতিভার নিদর্শন। অভাবনীয় অবস্থাসঙ্কটে, নৃশংস লালসার সম্মুখীন হইয়া নিরুপায় নির্ব্বোধ চাষার মেয়ে যাহা বলিতে বা করিতে পারে, তাহাঁরই অনাবৃত রূপ, ট্রাজেডি-সুলভ ভাষা ও ভাবের দ্বারা পূরণ না করিয়া কেবল তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া, দীনবন্ধু যেরূপ দেখাইয়াছেন তাহা শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের গৌরব। শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার এই দৃশ্যটিকে দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার 'অগ্নিপরীক্ষা' বলিয়া উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন: "জীবনের এত বড় নির্ম্মম কঠোর দিকটা যে কখনও দেখে নাই—নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের সারল্যে যে আজন্ম লালিত, চাষার ঘরের নির্ব্বোধ স্নেহে যাহার হৃদয় মন গঠিত, সে যখন সহসা জগতের এই নিষ্করুণ লোলুপতার মূর্ত্তি দেখিল, তখন তাহার আত্মরক্ষার যে প্রয়াস আমরা দেখি,

তাহাতে ট্রাজেডির নায়িকা-সুলভ আচরণ বা বাক্য-বিন্যাস নাই ; অজগর সর্পের আক্রমণে ক্ষীণপ্রাণা পক্ষীমাতার যে নিতান্ত নিষ্ফল আর্ত্তচীৎকার ও নখরাঘাত—এখানে তাহাই স্বাভাবিক।... এই অতি অশ্লীল দৃশ্যে, গ্রাম্য নারীচরিত্রের গ্রাম্য ভাষায় দীনবন্ধু একটি জীবনের সত্য, criticism of life, এখানে কাব্যরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।"

এই সব গ্রাম্য চরিত্রের স্বভাবাঙ্কনে, তাহাদের কথাবার্ত্তায় ভাবে ও ভঙ্গীতে, গ্রাম্যতা কেন অশ্লীলতাও রহিয়াছে। কিন্তু কেবল রুচির খাতিরে দীনবন্ধু তাহার কিছুমাত্র পরিবর্জ্জন বা পরিবর্ত্তন করেন নাই। ইহাতে রুচিবাগীশেরা তাঁহার নিন্দা করেন। তাঁহার হাস্যাত্মক রচনায় নাকি এই লক্ষণ আরও প্রচুর ও দোষাবহ ; সেই প্রসঙ্গে আমরা এই অভিযোগের আলোচনা করিব। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে, নীলদর্পণে যে গ্রাম্যতা বা অশ্লীলতা উক্ত হইয়াছে, তাহা দুর্নীতি বা আর্টের অশ্লীলতা নয় ; তাহা এই সকল চরিত্রের অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য। তাহা তাহাদের সহজাত অধিকার, কারণ তাহাদের ভাব ভাষা ও ভঙ্গী তাহাদেরই নিজস্ব। যখন সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং রুচিবাগীশ হইয়া দুষ্ট অংশের কাটছাঁট করেন নাই, তখন নাট্যকারের সমগ্র দৃষ্টি বাদ দিবে বা বদলাইবে কেমন করিয়া? বাদ দিলে বা বদলাইলে চরিত্রগুলি আস্ত থাকে না, তাহাদের স্বকীয় রূপ ও রসের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে তথ্যের ও সত্যের অপলাপ

করিতে হয়, এ কথা দীনবন্ধুর মত নাট্যরসিকের অজ্ঞাত ছিল না।

কিন্তু এই সব জীবন্ত চরিত্রে ও চিত্রে আশ্চর্য্য স্বভাবাঙ্কন ও করুণ রসের অভিব্যক্তি থাকিলেও আধুনিক কালের বিশিষ্ট সংজ্ঞায় নীলদর্পণ প্রকৃত ট্রাজেডি হইতে পারিয়াছে কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে। করুণ ও ট্রাজেডি একার্থক নয়। বিয়োগ বা মৃত্যু ট্রাজেডির মূল কথা নয়, কারণ অকরুণের মধ্যে, এমন কি জয়ের মধ্যে, মিলনের মধ্যেও, ট্রাজেডি থাকিতে পারে। মহাভারতের প্রকৃত ট্রাজেডি ইহার ভয়াবহ যুদ্ধবিগ্রহে ও ব্যাপক ধ্বংসলীলায় নয়,—কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের উপর পাণ্ডবদের জয়লাভের অসীম ব্যর্থতায়। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু যত বড় ট্রাজেডি হউক না কেন, সেই মৃত্যুর মধ্য দিয়া নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখীর মিলন আরও বড় ট্রাজেডি হইয়াছে। ইহা সত্য, অসহায় সংগ্রামের নিষ্ফলতা, দুঃখদুর্দ্দশার কারুণ্য, অথবা মৃত্যুর ঘনঘটা নীলদর্পণে যথেষ্ট রহিয়াছে। মনুষ্যত্বের অকারণ লাঞ্ছনা, জীবনের নিষ্ঠুর অপমান,—এ সমস্তই রহিয়াছে। কিন্তু এই যে অসহায়তা, দুঃখদুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা, অপমান ও মৃত্যু—এখানে এ সকলের কারণ সম্পূর্ণ বহিরঙ্গ, কেবলমাত্র কতকগুলি আকস্মিক ঘটনার দুর্ব্বিপাক। ইহাকে দৈব বলিতে পারা যায়, কিন্তু এ দৈব শুধু বাহিরের অন্ধ প্রকৃতির মত জগন্নাথের নিষ্পেষক রথচক্র। ইহা ভিতরের মানুষকে আলোড়িত করে, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে বটে, কিন্তু তাহা যেন তাৎপর্য্যহীন শক্তির অনাবশ্যক

ধ্বংসলীলা। ইহার মধ্যে দুঃসহ শোক বা কারুণ্য আছে, কিন্তু সত্যকার ট্রাজেডি কোথায়? ট্রাজেডির মূলে যে সূক্ষ্ম ভাব-কল্পনা থাকে, যাহা কেবল বাহিরের ঘটনারূপ দৈব নয়, অন্তরের পরস্পর-দ্বন্দ্ব-প্রবণ প্রবৃত্তিকেও মানুষের নিয়তি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা নীলদর্পণে নাই বলিলেও চলে। ইহার কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ আয়তনে বা আখ্যানবস্তুর সারল্যে ও ক্ষুদ্রতায় বিশেষ যায় আসে না, কিন্তু মানবহৃদয়ের যে-বেদনা ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে, তাহার মূল উদ্দীপনা ভিতরে নয়, বাহিরে—অন্তর্জ্জগতের বৈচিত্র্যে বা ঘাতপ্রতিঘাতে নয়, অবস্থাবিশেষের বা অনিবার্য্য ঘটনার ক্রূর আক্রমণের সহিত মানুষের নিদারুণ সংঘর্ষে।

দীনবন্ধুর প্রতিভার বহির্মুখী বাস্তবতন্ময়তা হয়ত তাঁহাকে মানবজীবনের এরূপ সূক্ষ্ম ভাবকল্পনায় আকৃষ্ট করে নাই, তাঁহার স্বাভাবিক প্রেরণা ইহার অনুকূল ছিল না। কিন্তু আধুনিক নাটকের না হোক্, প্রাচীন গ্রীক নাটকের অন্তর্গত যে ট্রাজেডি-পরিকল্পনা তাহার সহিত নীলদর্পণের করুণ ভাবের সাদৃশ্য আছে। বাহিরের বৃহত্তর নির্ম্মম শক্তির সহিত মানুষের অসহায় জীবনের নিষ্ফল সংগ্রাম,—ক্ষুদ্র মানুষ যেন দুর্লঙ্ঘ্য দৈবের ক্রীড়নক মাত্র,—এই গ্রীক ভাবটি বোধ হয় দীনবন্ধুর বিস্তীর্ণ ও বাস্তব-সচেতন সহানুভূতির উপযোগী ছিল। তথাপি, ট্রাজেডি হউক বা না হউক, নীলদর্পণের করুণ রস অলীক বা অসত্য হয় নাই। একদিকে বলদৃপ্ত পরস্বলোলুপ দুর্ব্বৃত্তের অমানুষিক অত্যাচার, অন্যদিকে অসহায় দীন দুঃখীর ভাগ্যচক্রে

নির্ম্মম নিষ্পেষণ,—যুগে যুগে দরিদ্র মানবের এই মর্ম্মচ্ছেদী বেদনার জীবন্ত আলেখ্য বাংলার বিশিষ্ট পল্লীজীবনের ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যেও যে সুস্পষ্ট হইয়া নির্ব্বিশেষ রসপদবীতে আরোহণ করিতে পারে, তাহা দীনবন্ধু তাহার সাময়িক করুণ উপাখ্যানে চিরন্তন করিয়া দেখাইয়াছেন।

(৩)

নীলদর্পণের আর একটি লক্ষণ উল্লেখযোগ্য, যাহা দীনবন্ধুর পরবর্ত্তী নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী ও কমলে কামিনী নাটকেও দেখা যায়। তাঁহার ভদ্রেতর চরিত্রগুলি নিখুঁত ও জীবন্ত, কিন্তু সেরূপ সাফল্য ভদ্রশ্রেণীর চরিত্রাঙ্কনে দেখা যায় না। যে দুইটি পরিবারের দুঃখের কাহিনী নীলদর্পণের প্রতিপাদ্য, তাহার মধ্যে সাধুচরণ অবস্থাপন্ন কৃষকমাত্র, গোলক বসু গ্রামের শিষ্ট সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু সাধুচরণ, রাইচরণ, রেবতী ও ক্ষেত্রমণি যেরূপ স্বাভাবিক হইয়াছে, গোলকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী ও সরলতা তেমন হয় নাই। ইহার একটি কারণ, ইহাদের মুখে যে ভাষা দেওয়া হইয়াছে তাহা পুস্তকগত আদর্শে আড়ষ্ট ও অনুপযোগী, এবং সেইজন্য ভাবও স্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু এই ভাষাগত ও ভাবগত অতিদোষের কারণ কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দীনবন্ধু যখন লিখিতে আরম্ভ করেন, তখনও ভাষা-সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই; দীনবন্ধুর ভাষাগত অতিদোষের ইহা একটি কারণ। তাঁহার হাস্যরসাত্মক নাটকে তিনি চরিত্রগুলির মুখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিখুঁত ভাষা বসাইতে পারিতেন, তাহার কারণ, এই চরিত্রগুলি তিনি এত প্রত্যক্ষ ও সমগ্রভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন যে, তাহাদের নিজস্ব ভাষাও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছিল। তোরাপ, আদুরী প্রভৃতি গ্রাম্য চরিত্রের ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু কাব্য-সম্মত বা শিষ্ট চরিত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি সেরূপ স্পষ্ট বা তীক্ষ্ণ ছিল না; সেইজন্য গম্ভীর আখ্যানে সে-সময়কার গুরু-গম্ভীর সাধুভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন। সে-যুগে অধিকাংশ কৃতবিদ্য ব্যক্তি উৎকট সংস্কৃতবহুল ভাষা প্রয়োগ করা ভাষার আভিজাত্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন মনে করিতেন। এমন কি, বেতালপঞ্চবিংশতির প্রথম সংস্করণে (১৮৪৭) বিদ্যাসাগরও এইরূপ ভাবিয়াছিলেন; সেইজন্য ইহাতে 'উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল উৎফুল্লফেননিচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর-তিমিনক্রচক্র-ভীষণ-স্রোত-স্বতীপতি-প্রবাহ-মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল'— এইরূপ বাক্যবিন্যাস ছিল, যাহা দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ আদর্শের ফলে সমসাময়িক নাটকে বা যাত্রার প্রথায় সাধুভাষার নামে একটি নিতান্ত অসাধু ভাষার প্রচলন ছিল। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের "জগতীতল এক্ষণে অস্মাদৃশ বিয়োগী ব্যক্তির হৃদয়ে নিজ নিজ তাপসমূহ সমর্পিত

করিয়া স্বয়ং সুশীতল হইল; অ-হ-হ! বিরহীজনসন্তাপে কাহারও সঙ্কোচ নাই” প্রভৃতি ইহার উদাহরণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। কেবল অর্থগৌরব-বর্দ্ধনের জন্য ইহা অপেক্ষা সংস্কৃতবহুল বাক্যের ব্যবহারও প্রশ্রয় পাইত।

শিক্ষিত বা শিষ্ট সমাজের প্রকৃত ভাষা অবশ্য এরূপ ছিল না, কিন্তু ইহা তাহাদের ভাষা বলিয়া কল্পিত ও প্রযুক্ত হইত। সীতা, শকুন্তলা বা দময়ন্তীর মুখে আর্য্যপুত্র প্রাণবল্লভ হৃদয়নাথ ইত্যাদি সম্বোধন কাব্যগত অবস্থায় শোভা পাইতে পারে, কিন্তু কারামুক্তি অর্থাভাব মকদ্দমা ইত্যাদি লৌকিক বিষয়ের বর্ণনায় গোলক বসুর পুত্রবধূর মুখে প্রাণেশ্বর জীবনকান্ত হৃদয়-বল্লভ ইত্যাদি শব্দ নিতান্ত অস্বাভাবিক। অবশ্য সৈরিন্ধ্রী শিক্ষিতা; সে সরলতার কাছে বিদ্যাসাগরের বেতালের পাঠ শুনিয়াছে এবং সাধুভাষা কাহাকে বলে তাহা জানে। কিন্তু নবীনমাধবের মৃতবৎ শরীরের পার্শ্বে মূর্চ্ছিতা জননী সাবিত্রীকে দেখিয়া তাহার এই বিলাপ—“আহা! হা! বৎসহারা হাম্মারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনধারা-পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন” ইত্যাদি,—ইহা অবস্থা ও পাত্রের অনুপযুক্ত হইয়া ঈপ্সিত করুণরসের প্রতিবন্ধক হইয়াছে। আবার নবীনমাধব পত্নী সৈরিন্ধ্রীকে বলিতেছে: “প্রেয়সি,…কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট; বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ,

অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ়, সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব ? পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর।" সৈরিন্ধ্রীর উত্তরও তদনুরূপ ঃ "জীবনকান্ত, আমি যে-কষ্টে ও নিদারুণ কথা বলিয়াছি তাহা আমিই জানি আর সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বরই জানেন, ও অগ্নিবাণ তার সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করে তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে!" ইত্যাদি। পত্নী সরলতার হত্যার পর শোক-সন্তপ্ত বিন্দুমাধবও উন্মাদিনী জননীর উদ্দেশে এইরূপ ভাষায় দীর্ঘ উচ্ছ্বাস করিয়া বলিয়াছে—"হে মাতঃ, জননী যেমন যামিনী-যোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোকবিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয় তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতাবধ-জনিত মনস্তাপে প্রাণ ত্যাগ করেন।…আহা মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্ততা কি সুখপ্রদ! মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তর-প্রাচীরে বেষ্টিত, শোকশার্দ্দূল আক্রমণ করিতে অক্ষম।" গ্রন্থের শেষে বিন্দুমাধবের গদ্যে পদ্যে বিলাপসূচক প্রকাণ্ড বক্তৃতাও এইরূপ বিসদৃশ হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে কেবল ভাষা নয়, ভাষার উদ্ভটতার জন্য ভাবও আড়ষ্ট।

এরূপ ভাষা যে শোকোদ্দীপক না হইয়া হাস্যজনক হইতে পারে এটুকু জ্ঞান সম্ভবতঃ হাস্যরসিক দীনবন্ধুর ছিল ; কিন্তু

মনে হয়, সাধুভাষা সম্বন্ধে দীনবন্ধু প্রচলিত প্রথা ও কালের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য প্রবন্ধে আরও অনেকগুণ অলঙ্কারকণ্টকিত সমাসবহুল ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। "অহো! পূর্ব্বভাগের গগনের উপর ধ্বান্তহর গুণাকর দিনকর করনিকর বিস্তার করতঃ কি এক নয়নপ্রফুল্লকর মনোহর ভাস ভাসিতেছে—দারুণ দুঃখের অন্ধকারস্বরূপ অন্ধকারকে নাশিতেছে—তিমিরারি তিমিরকে সহস্রকরে ধারণ করিয়া সহস্রকরে গ্রাসিতেছে, শাসক হইয়া তোমার এই সংসার শাসিতেছে; এই মিহির মহীর মনের মালিন্যমোচনমানসে পূর্ব্ব হইতে অপূর্ব্ব ভাবে ক্রমে ক্রমে পশ্চিম দিগে আসিতেছে; আলোক দ্বারা তপন আপন আগমন জ্ঞাপন করাতে সকল কমল অমল হইয়া কমলহৃদয়ে মধুভরে আলপন-প্রকাশপূর্ব্বক প্রেমানুরাগে ভাসিতেছে"—ইত্যাদি যে ভাষার উৎকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইত, তাহা "নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজা-নিকর-ক্ষেমঙ্কর" দীনবন্ধুর নীলদর্পণের ভূমিকাই সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাতে সন্দেহ নাই, গুরুর প্রভাব কেবল দীনবন্ধুর পদ্যের উপর নয়, গুরুগম্ভীর গদ্যের উপরও উৎকট ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। যেখানে গুরুর অনুকরণে তিনি ছড়া কাটিয়াছেন, যেমন—

এলো চুলে বেনে বউ আল্‌তা দিয়ে পায়।

নোলক নাকে, কলসী কাঁখে, জল আনতে যায়॥ ইত্যাদি—

সেখানে তিনি অপূর্ব্ব। কিন্তু লীলাবতীতে 'পয়ারে বয়ারেদের'

পয়ারকে 'গয়ার' বলিয়া নিন্দা করিলেও দীনবন্ধু পয়ারের মোহ একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই পয়ারে বিলাপ বা পয়ারে প্রেমালাপ তাঁহার নাটকগুলিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

এরূপ গদ্য বা পদ্য যে নাটকের উপযোগী নয়, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তখনও সাহিত্যের, বিশেষতঃ গদ্য-সাহিত্যের, ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গদ্যে, নাটকে, কবিতায় সকলেই নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কাব্যে ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন ও বিহারিলাল; নাটকে রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু; গদ্যে একদিকে সাধুভাষাপন্থী, অন্যদিকে আলালী নক্‌শাকার,—তখনও ইঁহাদের কেহই সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। একদিকে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা ১৮৫৪ ও সীতার বনবাস ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, অন্যদিকে আলালের ঘরের দুলাল ১৮৫৮ ও হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; এই তারিখগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নীলদর্পণের সহিত ইহাদের ভাষার কালক্রমিক সম্বন্ধ বোঝা যাইবে।

বিদ্যাসাগরের ভাষায় ওজস্বিতা ও লালিত্য থাকিলেও তাহা শব্দগৌরবে ভারাক্রান্ত; তাহাতে কাব্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু নাটকে তাহার প্রয়োগ সঙ্গত হয় না। আলালী ভাষা বা তাহার অনুবর্ত্তী হুতোমী ভাষা অধিকতর দ্রুত ও স্ফূর্ত্তিশালী ছিল, কিন্তু তাহার ভঙ্গী নিতান্ত লঘু বলিয়া তাহা গম্ভীর রচনায় স্থান পাইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী

নীলদর্পণের পাঁচ বৎসব পরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; তাহাই বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের প্রথম পথপ্রদর্শক। কিন্তু আরও সাত বৎসর পরে, কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) ও মৃণালিনীর (১৮৬৯) মধ্য দিয়া বিষবৃক্ষ (১৮৭২) ও ইন্দিরায় (১৮৭২) আসিয়া বঙ্কিমের ভাষা সর্ব্বশ্রীসম্পন্ন গদ্যে পরিণতি লাভ করিযাছিল। কিন্তু এই পবিণতিব সুযোগ দীনবন্ধুব উপকারে আসে নাই, কারণ দীনবন্ধুর সাহিত্য-জীবন শেষ হইয়াছিল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। অবশ্য, ভাষাব যথাযোগ্য সাহিত্যিক আদর্শ না থাকিলেও, ভাষার জন্য নাট্যকাবের বেশি দূর যাইবার প্রয়োজন ছিল না—জীবনের অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। সেইজন্য, দীনবন্ধু যেখানে অভিজ্ঞতাব প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার চিত্রাঙ্কনের মত ভাষাও হইয়াছে জীবন্ত,—খাঁটি বাংলা ভাষাব উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু যেখানে সৃষ্ট চবিত্রগুলির সহিত তাহার শুধু কল্পনাব যোগ ছিল, প্রাণের যোগ ছিল না, সেখানে তাহাদের ভাষা হইয়াছে কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত।

ঠিক এই কারণেই নীলদর্পণে ও অন্যান্য গাম্ভীর্য্যপ্রধান নাটকে দীনবন্ধুব করুণ বা কোমল চিত্রগুলি ভাবগত অতিদোষে দুষ্ট হইযা দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার অস্বাভাবিক ভাষাও ইহার জন্য অনেকখানি দাযী। প্রাণের গভীর আবেগ বা দুঃখ বিনাইয়া বিনাইয়া কথা বলে না, অথবা আড়ষ্ট ভাষায় লম্বা লম্বা বক্তৃতা বা কবিতার অপেক্ষা রাখে না। সেইজন্য

ক্ষেত্রমণির ধর্ষণ ও মৃত্যু, সাবিত্রী বা গান্ধারীর উন্মাদ আচরণ ইত্যাদি দৃশ্যে বৃহৎ আড়ম্বর বা বহুবাক্যব্যয় দেখা যায় না, এবং ভাবগত বা ভাষাগত অত্যুক্তি দোষ নাই বলিলেও চলে। কমলে কামিনী কল্পনাভূয়িষ্ঠ পুরাকাহিনী হইলেও, তাহাতে এই দোষ খুব বেশি নাই; তাহার কারণ, এই নাটকের গুরুতর গাম্ভীর্যটুকু হাস্য-পরিহাসের তরল ধারায় লঘু ও স্নিগ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সৈরিন্ধ্রীর বিলাপ, বিন্দুমাধবের শোকোচ্ছ্বাস, বিজয়-কামিনীর ভাবগদ্‌গদ আলাপ, অথবা ললিত-লীলাবতীর ত্রিপদী পয়ার বা মাইকেলী ছন্দে কথোপকথন প্রভৃতি—এই হিসাবে নীরস ও ক্লান্তিজনক হইয়াছে। দীনবন্ধুর এই চরিত্রগুলি যে একেবারে অস্বাভাবিক বা বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত হইয়াছে তাহা নয়,—তাহাদের মুখে কাব্যোৎকর্ষের জন্য যে ভাব ও ভাষা দেওয়া হইয়াছে তাহা সঙ্গত বা স্বাভাবিক হয় নাই। এই কৃত্রিম ভাব ও ভাষার আধিক্য যদি বাদ দেওয়া যায় তবে আপত্তির বেশি কিছু থাকে না।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন: "লীলাবতী বা কামিনী শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল না,—কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বঙ্গসমাজে ছিল না। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টসিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাংলা সমাজে ছিল না,—কেবল আজকাল নাকি দুএকটা হইতেছে শুনিতেছি।" দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে

বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু কেবল ইহার দ্বারাই তাঁহার চিত্রের অসম্পূর্ণতার ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রণয়-চিত্রগুলি ঠিক হাল্-ফ্যাসানের বিলাতী ধরণের কোর্টসিপ অথবা সংস্কৃত নাটকের পূর্ব্বরাগের নূতন সংস্করণ, তাহা বলা কঠিন। ঈশ্বর গুপ্তের বিদ্রূপ হইতে বুঝা যায়, সে-সময় স্ত্রীশিক্ষা ও একটু বেশি বয়সে মেয়ের বিবাহ দিবার চেষ্টা সমাজে অপ্রতুল ছিল না। ললিত-লীলাবতী, সিদ্ধেশ্বর-রাজলক্ষ্মীর চরিত্রাঙ্কনে স্পষ্টই উদীয়মান ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব রহিয়াছে; এমন কি নীলদর্পণে সরলতার মুখেও শুনি—"আমাদের মঙ্গল-সূচক সভাস্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই।" আজকাল দুএকটা শুনা যাইতেছে বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে নূতন ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং তাঁহার রচনায় সে নূতন ভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। বিলাতী ধরণে ধেড়ে মেয়ের কোর্টসিপ বলিয়া যাহার উপহাস করিয়াছেন, সেই কোর্টসিপ বা প্রেমের পূর্ব্বরাগ অঙ্কিত করিবার জন্য তাঁহাকেও বঙ্গসমাজ না হউক, রাজপুত পরিবার বা লক্ষ্মণ সেনের যুগ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। বিজয়-কামিনীর প্রথম দর্শনে অনুরাগ-সঞ্চার যদি বিলাতী হয়, তবে শিবমন্দিরে জগৎসিংহ-তিলোত্তমার পূর্ব্বরাগও সেই আদর্শে কল্পিত। নূতন ভাব ফুটাইবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থার বিরোধী বলিয়া ইতিহাসের আশ্রয় লইয়াছেন, দীনবন্ধুর সেখানে পুরাকাহিনী বা উপাখ্যানের আশ্রয়

গ্রহণ একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। দোষ এখানে হয় নাই, দোষ হইয়াছে প্রয়োগ-নৈপুণ্যের অভাবে।

আসল কথা হইতেছে, নূতন রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাবে রোমান্সের দিকে একটি কৃত্রিম ঝোঁক সে-যুগের অনেক লেখকের মত দীনবন্ধুরও মন অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু রোমান্সের সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা তাঁহার মত হাস্যরসিক ও বাস্তবশিল্পীর প্রতিভার উপযোগী ছিল না। বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনে যাহা নাই তাহাকে কল্পনা দিয়া পূরণ করিবার এই যে প্রচ্ছন্ন ভাবপ্রবণতা, তাহার অপরিপক্ব ফল হইতেছে বিজয়-কামিনী, ললিত-লীলাবতী ও নবীনমাধব-সৈরিন্ধ্রীর কৃত্রিম গদ্যে ও পদ্যে আলাপ ও উচ্ছ্বাস। কেবল শিখণ্ডিবাহন-রণকল্যাণীর সর্ব্বদোষনিষ্ক্রয়ী হাস্যপরিহাস-পটুতা আছে বলিয়া তাহারা অনেকটা বাঁচিয়া গিয়াছে। এই যুগের সৃষ্ট সাহিত্য ছিল কাব্যপ্রধান; সুতরাং গদ্যও ভাবুকতার সংস্পর্শে কাব্যগন্ধী হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃত রোমান্টিক অথচ গদ্যধর্ম্মী গদ্যের সৃষ্টি তখনও হয় নাই। নিছক রোমান্সে ও তাহার উপযুক্ত ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কারণ বাস্তবজ্ঞান ও রসবোধের সঙ্গে তাঁহার ছিল বৃহত্তর কল্পনা ও কবিত্বশক্তি। যে ভাববহুল আদর্শ বাঙালীর প্রত্যক্ষ জীবন ও জগতের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে পরিস্ফুট করা যায় না, তাহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অতীতের ইতিহাস অবলম্বন করিয়াছেন, দীনবন্ধু তেমনি কল্পিত কাহিনীকে স্থানকালোপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেবল কবিতা রচনায় নয়, ভাবমূলক

চরিত্রচিত্র আঁকিতে যে রোমান্টিক কল্পনা ও তদনুরূপ ভাষার প্রয়োজন দীনবন্ধুর তাহা ছিল না। তাই যেখানে বাস্তব ছাড়িয়া দীনবন্ধু ভাবুকতার আশ্রয় লইয়াছেন, অথবা নূতন রোমান্টিক সাহিত্যের প্ররোচনায় পুস্তকগত আদর্শের বশীভূত হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার চিত্র, ভাব ও ভাষার অতিদোষে, স্বভাবসঙ্গত হয় নাই। এই বিষয় বা চরিত্রগুলি তাঁহার অননুভূত; তাই ভাব ও ভাষার প্রয়োগও কৃত্রিম হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার তোরাপ-ক্ষেত্রমণি, জলধর-জগদম্বা বা মালতী-মল্লিকা যেরূপ সরস ও সুন্দর হইয়াছে, সেরূপ তাঁহার নবীনমাধব-সৈরিন্ধ্রী, বিজয়-কামিনী, ললিত-লীলাবতী বা সিদ্ধেশ্বর-রাজলক্ষ্মী হয় নাই। স্বভাবাঙ্কন সেইখানেই সার্থক হইয়াছে যেখানে বাস্তবমুখিতা ও হাস্যরস আছে; কিন্তু যেখানে রোমান্স ও বাস্তবের সংঘর্ষ হইয়াছে, সেখানে তাঁহার সহজাত রসবোধও তাঁহাকে ভাবাবেশের আতিশয্য হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।

নীলদর্পণে দীনবন্ধুর হাস্যরসের অবকাশ সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী (১৮৬৩) নবীন তপস্বিনী নাটকে ইহার প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়-কামিনীর উপকথামূলক প্রণয়-কাহিনীর সঙ্গে জলধর-জগদম্বা ও মালতী-মল্লিকার যে হাস্যাত্মক প্রসঙ্গ শ্লথসূত্রে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা গৌণ হইলেও চটুল কৌতুকরঙ্গের চমৎকারিত্বে প্রধান উপাখ্যান অপেক্ষা উপাদেয় হইয়াছে। সেইরূপ লীলাবতী নাটকে (১৮৬৭) গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখময় চিত্রের মধ্যে হেমচাঁদ-

নদেরচাঁদের মস্করা নাটকটিকে একেবারে নির্জ্জীব ও বৈচিত্র্যহীন হইতে দেয় নাই। নবীন তপস্বিনীতে হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ আনুষঙ্গিক মাত্র, না থাকিলেও প্রধান আখ্যানভাগের হানি হইত না; কিন্তু লীলাবতীতে মূল গল্পের সহিত ইহার হাস্য-কৌতুক একেবারে সম্পর্কহীন নয়, বরং অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রথিত। দীনবন্ধুর শেষ রচনা (১৮৭৩) কমলে কামিনীর উপাখ্যান ভাবপ্রধান, কিন্তু ইহাকে বাস্তব-জগতের পরিসরের মধ্যে রাখিয়াছে ইহার নিরবচ্ছিন্ন হাস্যপরিহাসের উজ্জ্বলতা। এই রোমান্টিক ধরণের রচনাগুলি নাটক হিসাবে সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই, কিন্তু রোমান্স বাদ দিয়া বস্তুজগতের দুর্ব্বলতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা যেখানে দীনবন্ধুর রসবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়াছে, সেইখানেই দেখিতে পাওয়া যায় প্রকৃত হাস্যরসিকের অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্ফূর্ত্তি। ইহা পৃথকভাবে ও আরও পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার তিনখানি হাস্যাত্মক রচনায়, বিশেষ করিয়া তাঁহার সধবার একাদশীতে।

এই হাস্যরসই ছিল দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তাঁহার নাট্যকল্পনা যেখানে সার্থক হইয়াছে সেখানেই দেখিতে পাই যে তাহার মূলে রহিয়াছে, অকিঞ্চিৎকর কৌতুকপ্রিয়তা নয়, প্রকৃত হাস্যরস। ইহা কেবল wit বা বুদ্ধিবিলাসের বাক্‌চাতুর্য্য নয়; satire বা সংশোধনপ্রয়াসী বিদ্রূপাত্মক দোষদৃষ্টি নয়; caricature বা ত্রুটিবিচ্যুতির অতিরঞ্জিত কৌতুকচিত্র নয়; হাস্যরস অর্থে তাহাই বুঝায় যাহাকে ইংরেজী

সাহিত্যে humour বলে। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের হাস্য-ভাণ্ডবহনকারী বিদূষকের যে ক্ষণভঙ্গুর বাক্‌পটুতা, অথবা ঈশ্বর গুপ্তের যুগে যে কৌতুক শ্লেষ ও গালিগালাজ রসিকতা বলিয়া গণ্য হইত, ইহা সেই ধরণের রঙ্গরসও নহে। উৎকৃষ্ট হাস্যরস ও উৎকৃষ্ট কাব্যকল্পনা,—সাহিত্যে উভয়েরই পরম সার্থকতা আছে। কাব্যরসকল্পনা ও হাস্যরসকল্পনা উভয়ের পার্থক্য রহিয়াছে অনুভূতির ভঙ্গীতে ও প্রকাশের রীতিতে, কিন্তু উভয়েরই বৈশিষ্ট্য হইতেছে জগৎ ও জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিবার দুর্লভ শক্তি। যাহা যেমন আছে তেমনি তাহারই মধ্যে, অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপের মধ্যেই, হাস্যরসিক রস সংগ্রহ করে; কবি বস্তুকে নিজের ভাবকল্পনার উচ্চতর ক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়া রসসৃষ্টি করে। হাস্যরসিকের আছে সহজ বস্তুনিবদ্ধ প্রীতি; কিন্তু স্বকীয় ভাবনাকে কবির বস্তু ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। তাই হাস্য-রসিকের সমবেদনাময় বস্তুদৃষ্টি দেখিতে পায় বৈসাদৃশ্য; কবির ভাবময় কল্পনা সৃষ্টি করে সামঞ্জস্য।

যাহা অসঙ্গত, অসুস্থ বা অসম্পূর্ণ তাহা দেখিয়া আমরা হাসি বা কাঁদি, কারণ আমাদের মন স্বভাবতই সঙ্গতি, স্বাস্থ্য বা অখণ্ড পূর্ণতার অভিলাষী। কিন্তু আমাদের আচারে ব্যবহারে চরিত্রে প্রত্যহ অসংখ্য অসঙ্গতি আসিয়া জমিতেছে,—আমরা তাহা সব সময় বিসদৃশ বলিয়া অনুভব করি না। আমাদের হাস্যপ্রবৃত্তি এই অসঙ্গতির বিরুদ্ধে—জীবনের ভুলভ্রান্তি, তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতার বিপক্ষে—আমাদের সতর্ক করিয়া রাখে। কবির কল্পনা

অসঙ্গতির স্থলে নবতর আদর্শের সঙ্গতি সৃষ্টি করে ; কিন্তু এই প্রতিদিন খর্ব্বীকৃত আদর্শের পূর্ণতা যাহাতে অসঙ্গতির মধ্যেই আমরা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই, তাহাই হাস্যরসিকের কার্য্য। মানবজীবনের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া আমাদের যেমন হাসি পায়, তেমনি আবার অনেক সময় আক্ষেপ ক্রোধ বা ঘৃণা হয়। কবির কারবার এই আক্ষেপ ক্রোধ বা ঘৃণা লইয়া ; কিন্তু এইরূপ বেরসিক-সুলভ চিত্তবিকার যে কত অসার ও হাস্যাস্পদ তাহা দেখাইয়া দেয় আমাদের হাস্যরসের প্রবৃত্তি। সকল বৈলক্ষণ্যের উপর ভাবজগতের বেদনা বা সৌন্দর্য্যের মায়াজাল বিস্তার করিয়া কবি অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি করে ; হাস্যরসিক মূর্ত্তিজগতের ক্লিষ্টতার মধ্যেও আনন্দের সন্ধান দেয়। সে আনন্দও অনাবিল, তাহাতে ক্রোধ ঘৃণা বা ক্ষোভ নাই। কবির ভাবকল্পনার মত হাস্যরসিকের রসকল্পনাও উদার ও গভীর ; তাই ইহা ভাবুকতা ব্যতিরেকেও অতি সাধারণ সুখদুঃখকে অসাধারণ করিতে পারে, অতি তুচ্ছকেও উপাদেয় করিবার ক্ষমতা রাখে। হাস্যরসিকের সহানুভূতি অতি সচেতন ; কবির ভাবপ্রবণতা ইহাতে নাই, কারণ ইহাও তাহার কাছে হাস্যকর। কিন্তু কবির ভাবকল্পনার মতই তাহার স্বাভাবিক প্রজ্ঞা ও সহজ অনুভূতি জীবনকে সঙ্কীর্ণভাবে না বুঝিয়া স্নিগ্ধনেত্রে ও সমগ্রভাবে গ্রহণ করে। তাই কোন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক লিখিয়াছেন : The humorist sees life more widely and wisely than any of the seers. It is not an intense and

narrow nature......the humorist can gaze at the totality of world's life.

দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা যেখানে চরিত্রসৃষ্টিতে সফল হইয়াছে সেখানে কেবল পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি নয়, হাস্যরসিকের বস্তুদৃষ্টি ও ব্যাপক সহানুভূতিও রহিয়াছে। হাস্যরসই তাঁহার প্রেরণার মূলে ছিল বলিয়া গম্ভীরবিষয়ক নাটকগুলিতে যেমন পৃথকভাবে রোমান্স বা করুণ রসের সৃষ্টি করিতে গিয়া তাঁহার নাট্যকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে, তেমনি নিছক হাস্যাত্মক রচনাগুলিতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। দীনবন্ধুর যে সঙ্কীর্ণ ও গহন মনোবৃত্তি, narrow and intense nature, ছিল না, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য হইতে বুঝা যায় যে "দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভাণ ছিল না"। তাঁহার বিচক্ষণ ও বিস্তীর্ণ সহানুভূতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখিয়াছেন ঃ "নিজে পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক-জীবন-সুখ বিফলীকৃতশিক্ষা নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্নমনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন"।

নাট্যরসিকের এই ব্যাপক জীবন-দৃষ্টি ও সমবেদনা ছিল বলিয়াই দীনবন্ধু করুণের মধ্যে হাস্য ও হাস্যের মধ্যে করুণের বিচিত্র অভিব্যক্তি দেখিতে পাইতেন। নীলদর্পণ নাটকে যে

নিরবচ্ছিন্ন করুণ ও বীভৎস ঘটনার ঘটা চলিয়াছে, তাহার মধ্যেও গ্রাম্যলোকের কৌতুককর কথাবার্ত্তায় ও চরিত্রসৃষ্টিতে হাস্যরসিকের উদার রসকল্পনা যেন সকল দুঃখ-দুষ্কৃতির উপর জয়ী হইয়া তাহাদিগকে তুচ্ছতা হইতে বাঁচাইয়া দিয়াছে। কেবল ভাবের প্রতিক্রিয়া বা relief হিসাবে নয়, জীবনের সমগ্র পরিকল্পনাতেও যেমন হাস্যের দ্বারা করুণ-রস তেমনি করুণের দ্বারা হাস্যরস আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইহার দৃষ্টান্ত দীনবন্ধুর সকল নাটকেই পাওয়া যায়। কাব্যের তথা-কথিত উপেক্ষিতাদের মত শিক্ষিতা সরলা পতিগতপ্রাণা শারদা-সুন্দরীর করুণ কোমল চিত্রটি আঁকিবার অধিক অবসর নাট্যকারের নাই, কিন্তু ধৈর্য্য ও ক্ষমাগুণের সঙ্গে স্নিগ্ধ রসিকতার রেখাপাতে তাহার চরিত্রটি সাধারণ করুণ-রসের নায়িকার মত ক্ষীণ ও অসার হইয়া যায় নাই। তাই তাহার হাপ্-পাড়াগেঁয়ে হাপ্-সহুরে বয়াটে স্বামীর মুখে শুনিতে পাই—'বাবা বলেন—বাড়ীর মধ্যে লক্ষ্মী বউ; বউ ভাল, ইয়ার বদ'। হেমচাঁদ নদেরচাঁদের মত মূর্খ ও দুর্ব্বৃত্ত নয়। শিথিলচরিত্র হইলেও সে শারদাসুন্দরীকে ভালবাসে, এবং নদেরচাঁদের প্ররোচনায় 'ঘরের মাগকে খেমটাওয়ালী' করিতে রাজি নয়। সুতরাং গুলির আড্ডায় তাহার নিন্দা শোনা যায়—'নদেরচাঁদ যে বলে হেমাকে হেমার মাগ খারাপ কল্লে তা মিথ্যে নয়'। স্ত্রীকে অপমান ও বয়াটে বৃত্তির চূড়ান্ত করিয়া, তাহার বাক্স উল্‌টাইয়া হেমচাঁদ তাহার সঞ্চিত টাকাগুলি জবরদস্তি করিয়া লইয়া

গেল বটে, কিন্তু সেই নৈপুণ্যরচিত কৌতুকদৃশ্যের মধ্যেই আবার তাহার মুখে আক্ষেপোক্তি শুনিতে পাই—'ভারি বদ্ ইয়ার'! এখানে তাহার প্রতি যেমন শারদাসুন্দরীর, তেমনি হাস্যরসিক নাট্যকারেরও ক্ষমাশীল প্রীতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

যে লোকোত্তর-শিল্পী বিধাতা মানবজীবনকে হাস্য ও করুণ রসের মিশ্রণে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়াছেন, হাস্যরসিক তাঁহারই অনুসরণ করিয়া মানবজীবনকে সমগ্রভাবে অনুভব করিতে চাহে। যেমন অতিদুঃখের মধ্যেও হাসি পায়, তেমনি হাসিতে হাসিতেও চোখে জল আসে। দীনবন্ধুর তিনখানি হাস্যরসাত্মক রচনায় অবারিত কৌতুক নানা ছন্দে নানা ভঙ্গিমায় বহুরূপীর মত বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। কিন্তু নিছক প্রহসন হইতে বেদনার অশ্রুদীপ্ত হাসি পর্য্যন্ত হাস্যরসের নিরবচ্ছিন্ন স্ফূর্ত্তি, কথাবার্ত্তায় ভঙ্গীভাবে চরিত্রচিত্রে ঘটনাসংস্থানে সর্ব্বত্র যে বিচিত্র ও উচ্ছলিত রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে কোথাও নাট্যকারের ক্রোধ বা ঘৃণা নাই, আছে শুধু স্নিগ্ধ রসকল্পনার সহজ ও উদার প্রীতি। চড় চাপড় কানমলা আছে সত্য, কিন্তু তাহার সবটাই রঙ্গ, সবটাই আনন্দ। তথাপি, এই অনাবিল আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে হাস্যরসিকের চক্ষুও যেন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। কেবল করুণ-রসকে হাস্যরস সমুজ্জ্বল করে নাই, হাস্যরসও করুণ-রসে স্নিগ্ধ হইয়াছে।

জামাই বারিক প্রহসন-প্রধান হইলেও এই জাতীয় হাস্য ও করুণ রসের মিশ্রণে যেমন উপাদেয় হইয়াছে, তেমনি বিয়ে পাগলা বুড়ো ও সধবার একাদশীর নিরবচ্ছিন্ন হাস্যপরিহাসের অন্তরালে নাট্যকারের নিবিড় বেদনা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ইহাদের চরিত্রচিত্রগুলিকে সরস ও মনোরম করিয়াছে। পদ্মলোচনের তুই স্ত্রী বগী ও বিন্দীর গ্রাম্য কোঁদল হইতে আরম্ভ করিয়া বড়লোকের পোষা জামাইদের ব্যারাকে অবস্থান ও লাঞ্ছনা, তাহাদের সিদ্ধিগাঁজাগুলি খাইয়া, পাঁচালী গাহিয়া, অন্দরমহলে যাইবার জন্য পাসের প্রতীক্ষায় দিনযাপনের গ্লানি পর্য্যন্ত সমস্তই অফুরন্ত কৌতুকরঙ্গের বিষয় হইয়াছে; কিন্তু ইহার সহিত পদ্মলোচন ও অভয়কুমারের অন্তর্গত কাহিনীর করুণ রসটি অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া গিয়া সমগ্র চিত্রটিকে আরও মর্ম্মস্পর্শী করিয়াছে। কৌলীন্য প্রথার প্রতি বিদ্রূপের যুগ তখনও অতীত হয় নাই। কুলীন-কন্যাদের কিরূপ তুরবস্থা ছিল তাহা রামনারায়ণ তাঁহার কুলীনকুলসর্ব্বস্বে দেখাইয়াছেন; কিন্তু বহু বিবাহের যে একটা বিপরীত দিক আছে, অর্থাৎ কুলীন-পুরুষদেরও কপালে তুর্গতি আছে, তাহার একটি হাস্যকর অথচ করুণ চিত্র, পদ্মলোচন ও তাহার তুই বিবদমান স্ত্রীর আখ্যায়িকায় দেখান হইয়াছে। তেমনি জামাই বারিকের অন্নদাস ঘরজামাইদের অবস্থা কেবল কৌতুককর প্রহসন নয়, করুণতর তুঃখও বটে। জামাইদের মধ্যে অভয়কুমারও একটি; তাহার স্ত্রী কামিনী অনুচিত বড়-মানুষীর প্রশ্রয়ে উগ্রস্বভাবা ও অপ্রিয়বাদিনী। তাহার হৃদয়

স্নেহশূন্য নয়, কিন্তু স্নেহের স্রোত অহঙ্কারের পাহাড়ে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে ভাবিত, অন্য জামাইদের মত অভয়কুমারও যখন 'তু করে ডাকতে আবার এয়েচে' তখন তাহার কোন আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান নাই। তাই তাহার স্পর্দ্ধা এত দূর বাড়িয়াছিল যে রাগের মাথায় স্বামীকে বলিল—'আজ তোমারি একদিন আর আমারি একদিন, খাটে উঠবে আর ন দিদির মত করবো—নাতি মেরে নাবিয়ে দেব।' অভয়কুমার দুঃখে অপমানে চলিয়া গেল। তখন সে বুঝিল, তাহার স্বামী নেশাখোর হইলেও জামাই বারিকের জাম্বুবান নয়। বড়লোকের মেয়ের অহঙ্কারদীপ্ত মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল; দাম্পত্যলীলার কলহ-কৌতুক চক্ষের জলে ভাসিয়া গেল। তাই পরে তাহারই মুখে শুনি—'সে রাত্রি আমার কালরাত্রি, স্বামীহারা হলেম; সে রাত্রি আমার শুভরাত্রি, স্বামীর মর্ম্ম জানলেম।' অভয়কুমার সম্বন্ধে পদ্মলোচন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছে, লোকটা 'অতিশয় স্ত্রৈণ'; কিন্তু এই গালাগালির মধ্যে এবং দাম্পত্যকলহের সুনিপুণ দৃশ্যে,—'গোঁয়ার হলে মাত্তেম', 'কামিনী, তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়েনি, আজ পড়ল', অথবা 'পদাঘাত করেনি কত্তে চেয়েছিল' ইত্যাদি অল্প কথায়—তাহার তেজস্বী অথচ স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের আভাস স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বিয়েপাগলা বুড়ো বিশুদ্ধ প্রহসন, কিন্তু প্রহসনের মধ্যেও উৎকৃষ্ট হাস্যরসের অভিব্যক্তি রহিয়াছে। অনেকেরই বৃদ্ধ বয়সে তরুণ হইবার সাধ যায়, কিন্তু এই সাধের একটা সীমা

আছে তাহা সকলে বুঝে না। সুতরাং কালপেড়ে ধুতি ও কলপের সাহায্যে বাহাত্তুরে-গ্রস্ত বিয়ে-পাগলা রাজীবলোচন বিদ্যাসুন্দর আওড়াইয়া যে যুবা সাজিবে এবং লোকসমক্ষে আপনার বয়স্কা বিধবা কন্যা রামমণিকে কন্যা বলিয়া পরিচিত করিতে যে কুণ্ঠিত হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। গ্রাম্য দলাদলি, গোঁড়ামি, মোড়লী, বিধবা কন্যার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার প্রভৃতি বিবিধ সৎক্রিয়ায় উৎসাহ থাকিলেও, জরাজীর্ণ দুর্ব্বল অবস্থায় রামমণিই তাহার একমাত্র সম্বল। নকল বাসর ঘরের সজোর কান মলা ও চড়-চাপড় বুড়া হাড়ে কত সহিবে, তাই গ্রাম্য ছোকরাদের দৌরাত্ম্য অসহ্য হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়-বালাবস্থা-প্রাপ্ত বিপর্য্যস্ত বৃদ্ধ, বিপদে পড়িয়া, নিজের তারুণ্য-ভান মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলিয়া গিয়া, অতি অসহায়ভাবে মাতৃস্থানীয় রামমণির উদ্দেশে চেঁচাইয়া উঠিল—'উঃ বাবা।...লাগে মা...মলেম...গিচি—মেরে ফেল্‌লে—দম আট্‌কালো, হাঁপিয়েচি মা,—ও রামমণি।' তাহার অবস্থার কৌতুকাবহ অথচ করুণ ভাবটি এই অল্প কথায় অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই জাতীয় রসসৃষ্টিতে করুণ ও হাস্য অঙ্গাঙ্গিভাবে তুল্যমূল্য।

(৪)

দীনবন্ধুর হাস্যরস ও নাট্যপ্রতিভা চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে তাঁহার সধবার একাদশী নাটকে। সে-যুগের প্রাচীন-

দীনবন্ধুর রুচি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সাধারণ-ভাবে একটি কথা বলা প্রয়োজন। গত যুগের রুচির সঙ্গে হয়ত এ যুগের রুচি খাপ্ খায় না, কিন্তু যুগে যুগে পরিবর্ত্তনশীল রুচিই সাহিত্যবিচারে একমাত্র কষ্টিপাথর নয়; কেবল ইহার দ্বারা রচনার সামর্থ্য বা অসামর্থ্য, উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার হয় না। ব্যক্তিগত বা যুগগত ভাল-লাগা মন্দ-লাগা নয়, রসসৃষ্টির মধ্যে যে বৃহত্তর প্রেরণা আছে তাহার দ্বারাই রুচির বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ কেবল বর্ণনীয় বস্তু নয়, বর্ণনার যে ভাবগত ও ভাষাগত ভঙ্গী এবং রচনার যে অভীষ্ট রসানুযায়ী সমগ্র তাৎপর্য্য, তাহার উপরেই রুচির সঙ্গতি বা অসঙ্গতি নির্ভর করে।

বর্ত্তমান কালের রুচিপরিবর্ত্তনের কতকগুলি কৃত্রিম কারণ রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের যে সুস্থ সহজ প্রকাশ হইতে দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা রস সংগ্রহ করিয়াছে তাহা আমরা এখন বুঝিতে পারি না, তাহার কারণ সেই জীবনের স্বাভাবিক প্রাণধারা হইতে আমরা অনেক দূর সরিয়া আসিয়াছি। আপাতদৃষ্টিতে বাঙালী হইয়াও বর্ত্তমান কাল্চার-বিলাসী কালের কৃত্রিম ভাবে ও চিন্তায় আমরা অবাঙালী হইতে বসিয়াছি,—অথচ এ কথা আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি না! নূতন আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হইয়া আমরা এখন নূতন ধরণের ভদ্রতা শিখিয়াছি। সূক্ষ্ম হাসি ও সূক্ষ্ম কথার অন্তরালে যাহাই থাক না কেন, বাহিরের সৌজন্য বজায়

থাকিলেই হইল। তাই সুস্থ ভাব ও সবল ভাষার স্বাভাবিক স্বচ্ছতা আমরা স্বীকার করি না ; নিছক মনোবিলাসের মোহে প্রাণের সহজ অনুভূতি ও আনন্দটুকু ভুলিয়া গিয়াছি। ইহার ফলে যে সৌখিন ভদ্রতানুকারী মনোভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য বাঙালীর রস ও রুচিকে জন-সাধারণের জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। সে-জীবন যত সত্য, যত স্বাভাবিক, যত আন্তরিক হউক না কেন, আধুনিক সভ্যতার ভদ্রসমাজের তাহার গ্রাম্যতা ও অর্দ্ধনগ্নতার স্থান নাই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জামা-কামিজ পরিয়া তবে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিতে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। সত্য হউক বা না হউক, গল্পটি এই 'মার্জ্জিত' মনোভাবের প্রতিরূপক। যাহা কথাবার্ত্তায় বেশভূষায় কেতা-দুরস্ত নয়, আধুনিক ড্রয়িংরুমে তাহার অসভ্য উপস্থিতিতে যে রুচিবিলাসী বাঙালী শিহরিয়া উঠিবেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

কিন্তু গতযুগের বাঙালীর দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অটুট ছিল, তাই তাহার বলিষ্ঠ উপলব্ধিতে সহজ জীবনের স্বাভাবিক গ্রাম্যতার আবিষ্কার ভয় বা লজ্জার কারণ ছিল না। প্রাণ ছিল বলিয়াই তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন, প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারিতেন ; এবং তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণের আনন্দ সূক্ষ্ম কৃত্রিম রুচির অপেক্ষা রাখিত না। ঠেঁটামি, নোংরামি, ভাঁড়ামি রসিকতা নয় ; কিন্তু যাহা বাঙালী জীবনের স্বতঃসিদ্ধ ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, যাহা তাহার সনাতন

ভাবভঙ্গী, চালচলন, রীতিনীতির স্বভাবতঃই অনুকূল, বাঙালীর সেই প্রাণখোলা কথাবার্ত্তা ও প্রাণখোলা উচ্চহাস্য, তাহার জীবনযাত্রার অনাড়ম্বর প্রণালী, আজকাল বিজাতীয় শিষ্টাচারের প্রাণশূন্য আবহাওয়ায় প্রায় লোপ পাইয়াছে। সে হাস্যও নাই, সে হাস্যের সহজ ভাষাও এখন ভাঁড়ামি বা নোংরামি বলিয়া মনে হয়। তাই আমরা সুস্থ প্রাণধর্ম্মের সহজ রসজ্ঞানের পরিবর্ত্তে মার্জ্জিত রুচির শুচিবাইগ্রস্ত হইয়াছি। পুঁথিপড়া কাল্‌চারের উত্তাপে আমরা নাকি অতীন্দ্রিয় রসের রসিক হইয়াছি,—তাই রসিকতা জিনিসটি কি তাহাও বুঝাইয়া দিতে হয়। ভাবসর্ব্বস্ব সাহিত্য ও ভদ্রতাসর্ব্বস্ব সমাজের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রযুগ যে মার্জ্জিত রুচির প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহা উৎকট রুচিবাগীশতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া অনেকে ইহাকে ব্রাহ্ম-মনোভাবের যুগ বলিয়াছেন। এ কথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না, এই যুগের আধিপত্যের সময় হইতেই আমাদের রুচিধ্বজিতা চরমে উঠিয়াছে।

এই রুচিধ্বজিতার মূলে রহিয়াছে অত্যধিক বিরূপতা-বিদ্বেষ, যাহা বাহিরের ফিট্‌ফাট্‌ চাক্‌চিক্যের পক্ষপাতী। সেই সঙ্গে আরও রহিয়াছে অতিরিক্ত দেহ-সচেতনতা। দেহঘটিত সব কিছু নাকি অশুচি ও অশ্লীল; দেহকে এড়াইয়া চলিলে নাকি আত্মার মহিমা বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা ও সাহিত্য দেহ-সত্যকে অস্বীকার করে নাই; বিরূপতাকেও জীবনে ও শিল্পে স্থান দিয়াছে; নরনারীর যৌন সম্বন্ধের উল্লেখমাত্রই

অসভ্যতা বলিয়া ধরে নাই। কিন্তু দেহকে সাক্ষাৎ পরিহার করিলেও, মানস-কল্পনায় বা সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের আড়ালে তাহার রসটুকু উপভোগ করিতে আধুনিক সভ্যতা ও সাহিত্যের আপত্তি নাই, কেবল বাহিরের ফিট্‌ফাট্‌ আবরণটি বজায় থাকিলেই হইল। অর্থাৎ দেহ-বাসনাকে ইঙ্গিতে ও ভঙ্গীতে প্রকাশ করিলে দোষ নাই, একমাত্র দোষ স্পষ্ট ভাষায় ও আচরণে। অরূপের আড়ালে রূপকে, অতীন্দ্রিয় রসের নামে ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার এই যে আধুনিক মিথ্যাচার, ইহাই নাকি মার্জ্জিত রুচি, বিশুদ্ধ রসিকতা।

কিন্তু রূপের তথ্যগত সত্যকে দীনবন্ধু ভাবসৌন্দর্য্যের মহিমায় মণ্ডিত, অথবা নীতিবাগীশতার প্রেরণায় খণ্ডিত করেন নাই। যেমন অতীন্দ্রিয় ভাবকল্পনা তাঁহার তীক্ষ্ণ বস্তুদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে নাই, তেমনি ক্ষুদ্র নীতিসংস্কার তাঁহার সরল অনুভূতির প্রীতিকে শুষ্ক করিয়া দেয় নাই। সেইজন্য যেমন অন্য নাটকে তেমনি সধবার একাদশীতে রোমান্স ছাড়িয়া দিয়া যেখানে অতিসাধারণ বাস্তব সুখদুঃখ ও ভুলভ্রান্তি তাঁহার সহজাত রসজ্ঞানকে উদ্রিক্ত করিয়াছে, সেখানে জীবনের সমগ্র বিরূপতা লইয়াই তাহা রূপায়িত হইয়াছে। যাহা বস্তুর আনুষঙ্গিক বা অপরিহার্য্য, তাহা বিরূপ হইলেও তাহাকে বাদ দিবার অথবা রোমান্টিক কল্পনায় মনোরম করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার মত বাস্তবনিষ্ঠ নাট্যকার ও সমগ্রদর্শী হাস্যরসিকের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

দীনবন্ধুর সামাজিক বহুদর্শিতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

প্রকৃত নাট্যকারের আত্মবিলোপক্ষম বাস্তবপ্রীতি তাঁহাকে অতি সহজে বিভিন্ন ধরণের লোকের সঙ্গে হাস্যরসিকের স্নিগ্ধ ও ঘনিষ্ঠ সহানুভূতি স্থাপন করিবার সুযোগ দিয়াছিল। কেবল ব্যক্তিগুলির অন্তঃস্থলে প্রবেশ করা নয়, তাহাদের জীবন ও জগৎকে সমগ্রভাবে অনুভব করিয়া, তাহাদের চালচলন কথাবার্ত্তা ভাব-অভাব গভীরভাবে আত্মসাৎ করিয়া, যেখানে যেটি সাজে সেখানে সেরূপ ভাবভঙ্গী ও আচরণ সন্নিবেশ করিবার যে প্রতিভা ও নৈপুণ্য তাহা দীনবন্ধুর ছিল। ইহার উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, দীনবন্ধু এই সকল অনুভূত চরিত্রের "নাড়ীনক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙালী লেখক তাহা তেমন পারেন নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে,—ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিকা"। বাস্তবিক, দীনবন্ধুর নিখুঁত চিত্রাঙ্কনে কোন কিছু কাব্যকল্পনার রঙে রঙীন করিবার, অথবা সূক্ষ্মাচারনিষ্ঠার খাতিরে কোন কিছু বাদ দিয়া অস্বাভাবিক করিবার প্রয়োজন ছিল না। নাট্যরসিকের এই পূর্ণ দৃষ্টি ছিল বলিয়াই, বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই লিখিয়াছেন, "আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ ও আস্ত আদুরী দেখিতে পাই; রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী ও ভাঙ্গা নিমচাঁদ পাইতাম।"

বাস্তবিক, এরূপ নাটকীয় রসকল্পনায় রুচির প্রশ্নই ওঠে না। জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিবার যে-দৃষ্টি, তাহাতে ভাল মন্দ দুই অনিবার্য্য; একটিকে বাদ দিলে অন্যটি অতিরঞ্জিত হইয়া উঠে। মার্জ্জিত বা সূক্ষ্ম করিয়া অঙ্কিত করিলে আসল বস্তুটিই অঙ্কিত করা হয় না। এখানে ভাবসুষমার কথা নয়, আদর্শের কথা নয়, রুচির কথা নয়,—কেবল বস্তুস্বরূপ বা ব্যক্তি-চরিত্রের কথা। যদি দোষ ও ত্রুটি থাকে, সে দোষ ও ত্রুটি বস্তু বা চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তাহা রুচিসম্মত না হইতে পারে, কিন্তু তাহার ভাব ভঙ্গী ও ভাষা সহজাত ও অপরিহার্য্য; বাদ দিয়া বা বদলাইয়া বিকৃত করিবার অধিকার নাট্যরসিকের নাই। সুতরাং যদি দুর্নীতির সজ্ঞান সমর্থন অথবা আর্টের প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতা চিত্রকরের অভিপ্রায় না হয়, তবে ক্ষুদ্র নীতি বা রুচির কথা অবান্তর। কেবল সেই বৃহত্তর নীতি যাহা মানুষকে মানুষ হিসাবে অপমান করে না, তাহাই এরূপ রসসৃষ্টির একমাত্র নীতি। সেইজন্য, যাঁহারা বলেন শ্লীলতার চেয়ে অশ্লীলতার দিকেই দীনবন্ধুর ঝোঁক বেশি, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, দীনবন্ধুর মত নাট্যরসিকের সমগ্র জীবন-দৃষ্টি শ্লীলও নয়, অশ্লীলও নয়,—নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ। যেখানে প্রাণ আছে সেখানে হাসি বেপরোয়া; যেখানে অনুভূতির প্রীতি আছে সেখানে রঙ্গ বেপরোয়া। কালির দাগ নাই বলিয়া মনের কুণ্ঠা নাই; লেখাও শ্লীলতা-অশ্লীলতার অলঙ্ঘ্য বিধিনিষেধের ঘোমটা টানিয়া বসে না।

তথাপি অনেকে ভাবগত না হোক্ দীনবন্ধুর ভাষাগত রুচি সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন। কিন্তু ভাবগত রুচির প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি তাহা ভাষাগত রুচি সম্বন্ধেও খাটে। দীনবন্ধুর ভাষা মার্জ্জিত ও ভদ্রসমাজের উপযোগী নয় বলিয়া যে অবজ্ঞার প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহারও মূলে রহিয়াছে বিকৃত বিজাতীয়ভাবাপন্ন ভদ্রতানুকারী মনোভাব। অঙ্কিত হাস্যাত্মক চরিত্রের সঙ্গে দীনবন্ধু তাহার নিখুঁত ভাষারও প্রয়োগ করিয়াছেন; আর্টের ভাষা বা ভদ্রতার ভাষা সেখানে অসঙ্গত হইত। তাহা ছাড়া, এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, ভাষার সহিত রহিয়াছে রসিকতার নাড়ীর যোগ। এককালে বাঙালীর যে প্রাণখোলা উচ্চহাস্য ও তাহার অনুরূপ ভাষা ছিল, যে জীবন্ত ভাষায় দীনবন্ধুর হাস্যাত্মক নাটকগুলি রচিত, সে ভাষা আমরা এখন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছি, তাই সে রসিকতাও বুঝিতে পারি না। জাতির ভাষা ও জাতির জীবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু এখন জীবনও নাই, তাহার ভাষাও নাই। আধুনিক অভিজাত সাহিত্যের ভাষায় মনের সৌখিনতা আছে, কিন্তু জীবনের স্পন্দন নাই। বিজাতীয় ভাব ও ভঙ্গীর পাকে প্রস্তুত অথবা ইংরেজী-তর্জ্জমাকরা ভাষায় যাহারা অভ্যস্ত, তাহারা বাঙালীর এককালে যে সহজ ও স্বাভাবিক ভাষা ছিল তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে না। দীনবন্ধুর কৌতুকনাট্যের ভাষার জন্ম হইয়াছে বাঙালীর অতিজাগ্রত বাস্তব-অনুভূতির স্বাভাবিক রসপ্রেরণায়। ইহাতে সংস্কৃতজনিত বিকার নাই, ইংরেজীনবীশী কৃত্রিমতাও নাই। খাঁটি বাংলা

রীতি ও ভঙ্গীতে, ভাষার প্রকৃতিগত সহজ সামর্থ্যে ইহা স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ। আর যদি দীনবন্ধুর ভাষার রুচি বিষয়বস্তুগত বিকৃতি না হইয়া কেবল শব্দ-অর্থগত vulgarity বা অপব্যবহার বলিয়া আপত্তি হয়, তাহা হইলে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে, শব্দের যে অভ্রান্ত প্রয়োগ, স্থানকালপাত্রোপযোগী শব্দবিন্যাসের যে অপূর্ব্ব কৌশল প্রকৃত হাস্যরসিক নাট্যকারের উপযুক্ত, দীনবন্ধুর এই সব রচনায় তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সত্যকার রসিক চিত্তই তাহার প্রমাণ।

দীনবন্ধুর বাস্তবানুরক্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখিয়াছেনঃ "দীনবন্ধু অনেক সময়ই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গড়িতেন; সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই অমনি তুলি ধরিয়া লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন"। ইহা সত্য; কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে দীনবন্ধুর স্বভাবাঙ্কন-ক্ষমতা ছিল কেবল ফটোগ্রাফি বা হুবহু-নকল করা নিছক realism বা বস্তুতৎপরতা। ভাস্কর বা চিত্রকরের যে উপমা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়াছেন, তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে ভাস্কর বা চিত্রকরের শক্তির অনুরূপ idealism বা প্রত্যক্ষ বস্তুর মানস-প্রতিচ্ছবি আঁকিবার স্বাভাবিক প্রেরণাও তাঁহার ছিল। মানবজীবনের কেবল কল্পনামূলক অবাস্তব চিত্র যেমন নিষ্ফল, তেমনি ইহার নগ্ন প্রাকৃতিক চিত্রও অসার। যাহা অশোভন, কর্কশ বা কুৎসিত তাহা মর্ম্মপীড়াকর; তথ্য হিসাবে তাহার মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু সত্য হিসাবে তাহা

সুখকর বা হাস্যাস্পদ হয় না। হাস্যরসিক স্বভাবশিল্পীর idealism ও সহানুভূতির পরীক্ষা এইখানেই। তাঁহার জাগ্রত চেতনা যেমন কল্পলোকের অপ্রাকৃত রসের সন্ধান করে না, তেমনি তাঁহার নিবিড় সমবেদনা বিসদৃশ প্রত্যক্ষেরও রসরূপ সৃষ্টি করে। মানুষের যাহা কিছু অসদ্‌গুণ তাহা নদেরচাঁদের জঘন্য চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান; কিন্তু এত বড় দুশ্চরিত্র মূর্খও ত আমাদের রাগ বিরক্তি বা ঘৃণার পাত্র হয় নাই; নাট্যকারের উদার হাস্যরসে অভিষিক্ত হইয়া সে কেবল তাহার হাস্যাস্পদ দুর্ব্বলতার প্রতি আমাদের মানবসুলভ আত্মীয়তার সহানুভূতি আকর্ষণ করে। ইহাই হাস্যরসিকের রসকল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে, পণ্ডিত রামগতি সধবার একদশীতে যে মাতলামি-বখামি ও নৈতিক শিক্ষার অভাব লইয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, সে অভিযোগের উত্তর হইল না; কারণ অপ্রীতিকর চরিত্রকে হাস্যরসিক শুধু হাস্যাস্পদ করেন, তাহাকে গর্হণীয় করেন না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, হাস্যরসিকের কারবার মানুষের মূঢ়তা বা দুর্ব্বলতা লইয়া, তাহার পাপ বা দুষ্কৃতি লইয়া নয়। নিষ্ঠুরতা, হিংসা, অপকার প্রভৃতি মনোবৃত্তি করুণ বা অন্য রসের অঙ্গ,—তাহাতে হাসিবার কিছুই নাই। সমাজ যাহাকে পাপাচরণ বলে তাহা যদি দুষ্টতা বা দূষিত প্রবৃত্তির ফল না হইয়া কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা বা ন্যূনতার ফল হয়, অথবা তাহার মধ্যে যদি কেবল অসাধুতা ভণ্ডামি বা ন্যাকামি থাকে,

তবে সেই বৈসাদৃশ্য হাস্যরসের বিষয়ীভূত। পাপ হউক পুণ্য হউক, মানুষের শক্তি বা অশক্তির পিছনে রহিয়াছে তাহার প্রচণ্ড আত্মাভিমান; তাই দুষ্টের অহঙ্কার ও শিষ্টের আত্মপ্রসাদ উভয়ই দুর্ব্বুদ্ধিতা বা নির্ব্বুদ্ধিতার প্রকাশ বলিয়া জীবনরস-রসিকের কাছে সমান কৌতুককর। কিন্তু বিকৃতি বা বৈসাদৃশ্যের একটা সীমা আছে, তাহা অতিক্রম করিলে আর হাসি থাকে না। মাতালের দুর্গতি দেখিলে হাসি পায়, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আমাদের ঘৃণা ভয় বিরক্তি বা অনুকম্পার উদয় হয়, সেই মুহূর্ত্তে আর হাসিবার অবসর থাকে না। এরূপ মনোভাব ট্রাজেডির অনুকূল, হাস্যরসের নয়। সেইজন্য হাস্যাত্মক নাটকে বা প্রহসনে বর্ণিত দুর্গতি ভয়াবহ বা দুস্তর হওয়া উচিত নয়; দুর্বৃত্ত পাত্রদের প্রচণ্ড নৈতিক দণ্ড হয় না—হইতেও পারে না। বড় জোর, জলধরের মত তুলা চিটেগুড় ও আল্‌কাতরার দ্বারা রূপান্তর-প্রাপ্তি, রাজীবলোচনের মত ঝাঁটা ও চপেটাঘাত, নিমে দত্তর মত কিল চড় ও কানমলা, অথবা নদেরচাঁদের মত ঘুঁসি ও গলাটিপিতে শেষ হয়। তাহাদিগকে যথেষ্ট হাস্যাস্পদ ও বিপর্য্যস্ত করাই হাস্যরসিকের উদ্দেশ্য; ইহা অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আনিলে নাটকে অনুচিত গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়ে। দুঃখান্ত নাটকে যেরূপ মৃত্যু প্রভৃতি গুরুতর অবসানের অবতারণা, হাস্যাত্মক নাটকে সেইরূপ লাঞ্ছনার স্থান। সমস্ত জীবনটাকে কৌতুকের চক্ষে দেখার মূলে যে কোন নীতি নাই, এ কথা বলিতেছি না, কিন্তু হাস্যরসিককে নীতিশিক্ষকের আসন গ্রহণ

করিতে বলিলে তাহার উদ্দেশ্যের অপলাপ করা হয়। সেইজন্য কোন বিজ্ঞ সমালোচক বলিয়াছেন : As comedy must place the spectator in a point of view altogether different from that of moral appreciation, with what right can moral instruction be demanded of comedy ?......Morality, in its genuine acceptation, is essentially allied to the spirit of tragedy.

নৈতিক শিক্ষা বা সহানুভূতি না থাকিলেও এই spirit of tragedy বা কারুণ্যের ছায়া হাস্যরসের একেবারে বহির্ভূত নয়। বরং ইহা যে তাহাকে আরও মনোরম ও মর্ম্মস্পর্শী করে তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই আমরা দীনবন্ধুর রচনা হইতে দিয়াছি। হাসি ও অশ্রুর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে প্রকৃত হাস্যরসের মধ্যে যে নিবিড় সহানুভূতি রহিয়াছে তাহা আমাদের চক্ষে অশ্রু আনিয়া না দিলেও তাহার কাছাকাছি পৌঁছাইয়া দেয়। তাহা যদি না হইত তবে হাস্যরস কেবল ভাঁড়ামি বা তামাসাতে পরিণত হইত। এই দিক দিয়া দেখিলে সধবার একাদশীর সর্ব্বপ্রধান চরিত্র নিমে দত্তর আলেখ্য কেবল একটি দুর্ব্বৃত্ত মাতালের উচ্ছৃঙ্খলতার ঘৃণ্য বর্ণনা নয়। কারণ, এই রচনাটি কেবল প্রহসন নয়, উৎকৃষ্ট হাস্যরসাত্মক নাটক। যাঁহারা ইহাকে কেবল জঘন্য মাতলামি ও বখামির বিবরণ মনে করেন, তাঁহারা ইহার মর্ম্মগ্রহণ করেন না।

'কলেজ-আউট' নব্যবঙ্গের নব-আলোকপ্রাপ্ত যুবক উচ্ছৃঙ্খলতার ও অধঃপতনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইতে কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু তাহারা ভদ্রসন্তান, নিতান্ত মূর্খ পশু নয়। দুঃশিক্ষা ও নির্ব্বুদ্ধিতার মোহে তাহাদের সহজ জ্ঞান অনাচারের মধ্যে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, কিন্তু স্বভাবতঃ তাহারা দুর্ব্বৃত্ত ছিল না। তাহাদের মধ্যেও বিভিন্ন-প্রকৃতির ব্যক্তি ছিল। ঘটিরাম ডেপুটির যে কুসংস্কার ছিল না, তাহা দেখাইবার জন্য এই অবতারটি অনায়াসে মদ্যপান, মুরগীভক্ষণ, বেশ্যালয়গমন করিতে এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা একদিনে বিসর্জ্জন দিতে পারিত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে ছিল অতি নির্ব্বোধ, ভণ্ড ও কাপুরুষ। ব্রাহ্ম হইয়াও 'হিন্দুদিগের নিন্দা'র ভয়ে প্রকাশ্যভাবে এ সমস্ত করিতে সাহস করিত না। সেইজন্য কলেজে-পড়া হইলেও ঘটিরাম পুরাদস্তুর নব্যবঙ্গ নয়; নব্যবঙ্গের আদর্শস্বরূপ নিমচাঁদ তাহাকে ক্যাডাভ্যারাস্ ও arrant coward বলিয়া উপহার করিয়াছে। নিমচাঁদ যে ঘটিরামকে silly বলিয়াছে, তাহার কারণ সে ডেপুটি বলিয়া ধরাকে শরা জ্ঞান করে, সর্ব্বত্র লেজে বাঁধিয়া আরদালীকে লইয়া যায়, কাহারও বাড়ী গেলে উচ্চ আসনে বসে; এবং যখন শামলা মাথায় দিয়া পায়চারী করে ও মেয়েরা দেখিয়া হাসে তখন সে গৌরব বোধ করে। ঘটিরাম নব্যবঙ্গের philistine মদ খাইতে বা কুকর্ম্ম করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা কিন্তু সাহসে কুলায় না; এবং আঙুল ডুবাইয়া মদ চাখিয়া আঙুলধোয়ার নিষ্ঠাটুকুও আছে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, কিন্তু

ধর্ম্মের ধার ধারে না ; হিন্দুদের মন রক্ষার জন্য ঠাকুর দেখিতে গিয়া ঝনাৎ করিয়া টাকা ফেলিয়া দিয়া প্রণাম করে ; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সময়মত দু-এক টাকা ঘুষ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। নিজের ঘুষ লইতে প্রেজুডিস্ নাই, কিন্তু ডিস্মিসের ভয় আছে। আইনের বিদ্যার দৌড় আরদালী খুড়োর শরণাপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত। আর কলেজে পড়িলেও ইংরেজী বিদ্যায় সে দিগ্‌গজ। অকাল-কুষ্মাণ্ড ভোলার সঙ্গেই পাল্লা দিতে পারে না ; নিমচাঁদের মত ইংরেজীতে বলিতে, লিখিতে, পড়িতে, চিন্তা করিতে লায়েক নয়, ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখা ত দূরের কথা।

নিমচাঁদ মাতাল ও দুশ্চরিত্র হইলেও এরূপ অপদার্থ নয়। উচ্ছৃঙ্খল ও অনাচারী হইলেও নব্যবঙ্গের মধ্যে বাস্তবিক অপদার্থের সংখ্যা বেশি ছিল না। তাহাকে এরূপ অপদার্থ করিয়া অঙ্কিত করিলে চিত্র স্বাভাবিক হইত না, বিদ্রূপও সফল হইত না। নিমচাঁদের সহস্র দোষ সত্ত্বেও সে সরল, খলদ্বেষী, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান ও নির্ভীক ছিল ; ঘটিরামের মত ভণ্ড কাপুরুষ ও মিথ্যাবাদী নয়। অহঙ্কার থাকিলেও অলীক আত্মম্ভরিতা নাই। নিজের দোষগুণ সে বুঝিতে পারিত, এবং তাহার বেশি দাবী করিত না। ঘটিরামকে নিমচাঁদ বেশ অমায়িক ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছে—'আমি অটলের বৈঠকখানায় মদ খাই, এক্ষণে টলে পড়ে রয়েছি…ডেপুটী বাবু, আমি তোমার পিনাল কোড, এতে সব ক্রাইমই আছে, আমারে হাত ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি'। পুনরায় তাহার মুখে শুনি—'আমি অতি

দীন, সহায়সম্পত্তিহীন, কোনরূপে অটলের টেবিলে, নকুলবাবুর বাগানে হরিনামামৃত পান করে মাতালযাত্রা নির্ব্বাহ করি'। আবার নেশার চরম অবস্থায় প্রচ্ছন্ন আত্মধিক্কারের বশে সে নিজেকে বলিয়াছে—'রে পাপাত্মা! রে দুরাশয়! রে ধর্ম্ম-লজ্জামানমর্য্যাদাপরিপন্থী মদ্যপায়ী মাতাল'। নিমচাঁদ মদ খায় বটে, কিন্তু লুকাইয়া নয়; বরং রোগ বা নিন্দার ভয়ে মদ ছাড়িয়া কলেজের নাম ডুবান, অথবা গোকুলবাবুর মত ভণ্ডামি করিয়া সুরাপাননিবারিণী সভায় নাম লেখান, সে ভীরুতার লক্ষণ বলিয়া মনে করে। মিল্‌টনের উন্নতচেতা শয়তানের মত—'To be weak is miserable, doing or suffering'—ইহাই ছিল তাহার motto। এমন কি শেষকালে নির্দ্দয় প্রহারের পরও, অটলের মত মদ ছাড়িয়া দিবার নামটি পর্য্যন্ত সে করে নাই। এরূপ মার খাওয়া যে তাহার মাতালযাত্রার আনুষঙ্গিক ফল তাহা সে জানিত; সুতরাং ইহার জন্য অটলকে দোষ দেওয়া অথবা প্যান্‌পেনে কাঁদুনী গাওয়া সে কাপুরুষতার লক্ষণ মনে করিত। স্বয়ং যে নির্ব্বোধ অটলের মাথাটি খাইতেছে তাহা সে বুঝিত, এবং তাহা গোপন করা প্রয়োজন মনে করিত না—'অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে এত মজা কচ্চি'। অটলকে মদ ধরাইবার উদ্দেশ্যও সে পরিষ্কার-রূপে বলিয়াছে—'এক বেটা বড়মানুষের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়', 'ওর বাপ্ অনেকের সর্ব্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকাগুণো সৎকর্ম্মে ব্যয় হোক্'। তাই যখন

অটলের পিতা জীবনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—'তুই কি নিমচাঁদ ?' তখন কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া নিমচাঁদ উত্তর দিল—'হাঁ বাবা, আমি তোমার কালনিমে মামা'।

নিজে কতদূর অধঃপতিত নেশার ঝোঁকে তাও সে বুঝিত, তাই হাসির ছলে তাহার আর্ত্তনাদ শুনি—'তুমি স্কুল থেকে বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ···তুমি কে, চাও কি, কাঁদ কেন ? আমি সকলের ঘৃণাস্পদ, আমি জঘন্যতার জলনিধি, আমি আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই'। Melodrama বা sentimentality তাহার চরিত্রে নাই; তবে মদের নেশা চড়িলে মনস্তাপের কান্নাটাও বেশ জমিত। প্যানপেনে গদ্‌গদভাবের নির্ব্বেদ বা বিলাপ করিবার ছেলে সে নয়; তবুও অনুতাপের তুষাগ্নি যখন সে সুরার সুধাসমুদ্রে ডুবাইতে চেষ্টা করিত' তখন মাতলামির কান্নাটা বেশ নিবিড় হইয়া উঠিত—

So sweet was ne'er so fatal, I must weep,—
But they are cruel tears !

তাহার মত শিক্ষিত ভদ্রযুবকের চরম অপমান—গোকুলবাবুর দরওয়ানের হাতে গলাধাক্কা খাইয়া সামান্য মাতালের মত প্রকাশ্য রাজপথে পড়িয়া থাকা; কিন্তু আপাততঃ সার্জ্জন সাহেবের son-in-law হওয়া ভিন্ন তাহার কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই। মদই যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা সে বোঝে; সে আরও বোঝে যে বিধাতা তাহাকে যে অমৃতরস দিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন,

তাহা এখন গরলে পরিণত হইয়াছে। তাই অন্তর্লীন ক্ষোভে নৈরাশ্যে সে বলিয়াছে—'মদ কি ছাড়বো? আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় ছাড়ে কই? সেকালে ভূতে পেতো এখন মদে পায়,—ডাক ওঝা, ডাক ওঝা, ঝাড়িয়ে আমায় মদ ছাড়িয়ে দিক।' এই দুর্দ্দমনীয় পিপাসা তাহার সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নির্ম্মূল করিয়া তাহাকে পশুবৃত্তিধারী ও পরমুখাপেক্ষী করিয়াছে। তাহাতে দিন বেশ মজায় কাটে, কিন্তু আত্মসম্মান কাঁটার মত মর্ম্ম বিদ্ধ করে। নিমচাঁদ গর্ব্বিত উন্নতচেতা ও আত্মাভিমানী; কিন্তু যে আত্মগৌরব ও তেজস্বিতার মুখে সে দত্তকুলপ্রাধান্য ব্যাখ্যা করিয়াছে, সেই মুখেই কিছু পরে সে সমস্ত গর্ব্ব ধূলায় নিক্ষেপ করিয়া পরপিণ্ডাশনরূপ রুদ্ধ মর্ম্মবেদনা সপরিহাসে কেনারামের কাছে ব্যক্ত করিয়াছে ঃ 'ধর্ম্ম অবতার, ঘটিরাম অবতার, বরাহ অবতার, শ্রুত আছেন স্বনামো পুরুষো ধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম। বিচারপতি আপনি হাকিম, ঘটিরাম, আমি সেই অধমাধম—শ্যামবাজারের মহেশ্বর ঘোষ আমার শালা, তাঁর বাড়ীতে আমি থাকি; সেই শালার নাম না করলে কোনও শালা চিনতে পারে না।'

কিন্তু ধর্ম্মলজ্জাহীন নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপ হইলেও নিমচাঁদের প্রকৃতি কেনারামের মত পদার্থহীন, অথবা গোঁয়ার মূর্খ অটলের মত সর্ব্বসদ্‌গুণবর্জ্জিত নয়। তাহার মুখে ইংরেজী বুলির খই ফোটে, কিন্তু ইংরেজী বিদ্যায় সত্য সে কিরূপ পারদর্শী তাহা

মায়েব উপব, নিমচাঁদেব উপর, এমন কি কাঞ্চনেরও উপর। কাঞ্চনের বিরুদ্ধে নিমচাঁদ তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে—'বাবা, তুমি বোকারাম, অকালকুষ্মাণ্ড, তুমি বেশ্যার বজ্জাতির অন্ত পাবে?' অটল আপনাকে মনে করে অত্যন্ত রসিক, এবং কলিকাতাব নামজাদা বাবুদের শিরোমণি; কিন্তু তাহার পত্নী কুমুদিনী ননদ সৌদামিনীকে যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিক—'তোমার দাদা যে যণ্ডামার্ক, সে রসিকতার কি ধার ধারে। শুনেছে কাঞ্চনকে অনেক বড়মানুষের ছেলে বেখেছিল, অমনি তার জন্য পাগল হয়েছে। রূপ গুণ বয়েস তোমার দাদা ত চায় না, কিসে লোকে বাবু বলবে তাই দেখে'। অটলের লজ্জা, সঙ্কোচ, মান, মর্য্যাদাজ্ঞানের লেশমাত্র নাই। নিমচাঁদ বৃদ্ধ জীবনচন্দ্রকে 'তোমার মন্দোদরী' বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু অকালপক্ক জেঠামিতে শিষ্য গুরুকে ছাড়াইয়া যায়। সে বাবুয়ানার জন্য যে কেবল কুটিলস্বভাবা, স্বার্থপরায়ণা, মায়ের বয়সী কাঞ্চনকে বৃত্তিভোগী করিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু কাঞ্চনের গলা জড়াইয়া বারণ্ডায় নাচিয়া পাড়ার লোক জমা করিতে পারে; এবং তাহাতে যদি গুরুজন রাগ করে তাহাদিগকে অপমান করিতে বাকি রাখে না। আপনার মা-বাপকে দিয়া বেশ্যার খোসামোদ করাইয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করে; বাপের বা শ্বশুরের সামনে মুখে আটক নাই। জীবনচন্দ্র পুত্রের ব্যবহারে ক্ষোভে দুঃখে গলায় দড়ি দিতে চাহিয়াছেন; অটল তাহা শুনিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে বলিল—'দাও তেরাত্রে শ্রাদ্ধ করবো'। সকল দুষ্কর্ম্মের চূড়ান্ত—

নিজের খুড়শাশুড়ীকে ধরিয়া আনিতে লোক পাঠানো; কিন্তু ইহারও সূত্রপাত শুধু লাম্পট্য হইতে নয়,—প্রধান উদ্দেশ্য গোকুলবাবুকে জব্দ করা ও কাঞ্চনের দর্পচূর্ণ করা। অবশেষে জুতার চোটে গায়ের জ্বালায় অটল একবার বলিয়াছিল—'আমি মদ ছেড়ে দেব'। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বলিল—'নিমচাঁদ ওঠ, বাবা না আসতে আসতে আমরা বাগানে যাই। যে মার খেয়েছি, অনেক ব্রাণ্ডী না খেলে বেদনা যাবে না'। অতএব নিমচাঁদের শেষ কথাই ঠিক—'মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি। সধবার একাদশী, তুমি যার পতি ॥'

সধবার একাদশীর তিনটি প্রধান ভূমিকার এইরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, অঙ্কিত চরিত্রের সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতা সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইয়াছে; সেইজন্য নাট্যকার নাটকটির অন্য কোনরূপ সমাপ্তি কল্পনা করিতে পারেন নাই। দুষ্টের দণ্ড বা অসন্মার্গপরিত্যাগ প্রভৃতি উপসংহার নাটকের গতির ও চরিত্রগুলির প্রকৃতির সহিত খাপ খাইত না। ইহা আরও উল্লেখযোগ্য, 'কুরুচি' এখানে নাটকের বিষয় বটে, কিন্তু শুধু কুরুচির জন্য কুরুচি চিত্রিত হয় নাই, মনের কোন অনুচিত বিকার ঘটান ইহার উদ্দেশ্য নয়। শিল্পীগঠিত নগ্নমূর্ত্তিতে অশ্লীলতা নাই, অশ্লীলতা আসে শিল্পীর অভিপ্রায়ে, ভঙ্গীতে বা ভাবগঠনে। কিন্তু ভাবজ্ঞ হাস্যরসিক, নীতিশিক্ষক বা ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া, বর্ণিত ঘটনা বা চরিত্রগুলিকে কুৎসিত বা ঘৃণিত করিয়া আঁকিতে পারে না; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘৃণা বা জুগুপ্সা আসিলে

হাস্যরস থাকে না। তাই হাস্যরসিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতিও বিভিন্ন। নাটকটির মধ্যে নব্যবঙ্গের অধঃপতন ও নির্ব্বুদ্ধিতার যে হাস্যসমুজ্জ্বল চিত্র রহিয়াছে, তাহাকে চিত্রকরের আন্তরিক বেদনাও ওতপ্রোত হইয়া সত্যই মর্ম্মস্পর্শী করিয়াছে। সধবার একাদশী এই নামটি সেই বেদনা বা আক্ষেপের নিদর্শন। কলেজে পড়িলেই নিমচাঁদ বা কেনারামের মত বাঁদর হইতে হইবে, তাহা যে দীনবন্ধু বিশ্বাস করিতেন না তাহা কুমুদিনী ও সৌদামিনীর কথোপকথন হইতে বুঝা যায়। কিন্তু আক্ষেপের এই করুণ ভাবটি কখনও মুখ্যভাবে প্রকাশিত হইয়া নাটকের হাস্যরসের অন্তরায় হয় নাই, বরং ইহাকে স্নিগ্ধ ও সরস করিয়াছে।

অনেকে বলিবেন, এত প্রসঙ্গ থাকিতে দীনবন্ধু এরূপ বিশিষ্ট আখ্যানবস্তু গ্রহণ করিলেন কেন? কোন্ লেখক যে কি প্রেরণায় কি বস্তু গ্রহণ করেন, তাহা বলা কঠিন; তাহা অনেকটা স্থান কাল ও প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। এই সমস্যাটি যে সে-যুগে একটি প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার প্রমাণ, নূতন সভ্যতার প্রধান গোঁড়া মধুসূদন একদিন খাঁটি সাহেব হইয়াও 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) বলিয়া সেই সভ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রহসন দীনবন্ধুর আদর্শ হইতে পারে; কিন্তু এ স্থলে আদর্শ ও প্রতিকৃতি উভয়েরই একটি নিজস্ব গৌরব আছে। আবার অনেকে মনে করিয়াছিলেন, নিমচাঁদ দত্ত মধুসূদন দত্তেরই ক্যারিকেচার; কিন্তু

দীনবন্ধু স্বয়ং তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌পটুতায় ইহার জবাব দিয়াছিলেন—"মধু কি কখনো নিম হয়?" যাহা হউক, তখনকার দিনে এই সমস্যা একাধিক লেখকের মন আলোড়িত করিয়াছিল; এবং নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া ইহাকে উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না। এই যুগসঙ্কটে দীনবন্ধুর শক্তি ও সমবেদনা তাঁহাকে তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত পথেই প্রেরণ করিয়াছিল। দীনবন্ধুর স্বজাতিবাৎসল্য বঙ্কিম-চন্দ্রের মতই আন্তরিক ছিল। বাঙালীর বাঙালীত্বকে তিনি সকলের উপর স্থান দিতেন; তাই পরিবর্ত্তন-যুগের শিক্ষিত বাঙালীর এই জাতিধর্ম্মচ্যুত অনুকরণের মোহ তাঁহার মনকে ব্যথিত ও প্রতিভাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দীনবন্ধুর যুগ কেবল বিপ্লবের যুগ ছিল না, গঠনেরও যুগ ছিল। নব আদর্শের সংঘর্ষে প্রাচীন আদর্শ চূরমার হইয়া যাইতেছিল, কুপ্রথার সঙ্গে দেশের সুপ্রথাগুলিও ভাসিয়া যাইতেছিল; এবং নূতন ধরণের কুপ্রথার আমদানির সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু জাতীয় ভাব ও জাতির স্পর্দ্ধার বস্তু তাহাও নবশিক্ষার উন্মাদনায় নব্যবঙ্গের যুবক হেলায় হারাইতেছিল। এই ভুল বুঝাইবার জন্য কেবল আদর্শসৃষ্টি নয়, প্রত্যক্ষ জীবনের হাস্যাস্পদ দুর্ব্বলতার আলেখ্যদর্পণে আপন মুখ আপনি দেখিবারও প্রয়োজন ছিল। তাই কেবল কল্পনাকুশল বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবশিল্প নয়, দীনবন্ধুর স্বভাবশিল্পেরও প্রয়োজন ছিল; কেবল কাব্যকাহিনীর মাধুর্য্য নয়, বাস্তবচিত্রের তীক্ষ্ণতাও অপেক্ষিত ছিল।

দীনবন্ধুর অসাধারণ সামাজিক অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ অনুভূতি, মানুষের উপর বিপুল বিশ্বাস ও প্রীতি, উদার ও অফুরন্ত হাস্যরসের শক্তি তাঁহাকে এরূপ নাট্যচিত্রাঙ্কনের বিশেষ উপযোগী করিয়াছিল। শুধু কৌতুকের জন্য কৌতুক করা, বা নগণ্য বিষয় লইয়া হাল্‌কা রসিকতা করা, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে-যুগের ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্ব্বলতাকে ক্ষমাশীল অন্তরের স্নিগ্ধ অনুভূতি দিয়া, স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসে সমুজ্জ্বল করিয়া, জীবন্ত মানুষ ও তাহার জীবন আঁকিবার প্রেরণাই ছিল তাঁহার সকল সৃষ্টির প্রেরণা। বাঙালীর দোষ-গুণ, হাসিকান্না, আশানিরাশা—কোন কিছুই তাঁহার সহাস নেত্রের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই; কারণ বাঙালীর আপাত অধঃপতনকে হাস্যাস্পদ করিয়া চিত্রিত করিলেও, বাঙালীর প্রাণধর্ম্ম যে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। সে-যুগের যে সমস্যা এ-যুগের তাহা নয়; কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক ও সাহিত্যিক বৃক্ষে আরূঢ় বানরগুলিকে আঁকিবার জন্য এইরূপ নাট্যরসিকের আজও প্রয়োজন রহিয়াছে। নাট্যকারের উপকরণ যুগধর্ম্মের বশবর্ত্তী সত্য, কিন্তু তাঁহার শিল্পের সার্থকতা নিয়ন্ত্রিত উপকরণে নয়, সকল সাময়িক ও বিশিষ্ট উপকরণের মধ্যে যাহা চিরন্তন ও সর্ব্বগত তাহারই পরিকল্পনায় ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যে। দীনবন্ধু কেবল সে-যুগের মাতাল আঁকেন নাই, সকল যুগের মানুষ আঁকিয়াছেন। রোমান্সে বা রোমান্টিক কবিকল্পনায় দীনবন্ধুর অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ;

তিনি চোখ দিয়া যেমন স্পষ্ট ও পরিষ্কার দেখিতেন চোখ বুজিয়া তেমন পারিতেন না। তাই কাঁদাইতে পারিলেও তিনি হাসাইতে পারিতেন অনেক বেশি। অপরিণত যুগের অনেক অসম্পূর্ণতা তাঁহার রচনায় রহিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার নাট্য-প্রতিভায় যে উৎকৃষ্ট হাস্যরসের অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহা আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। যাহা অস্ফুট, যাহা অতীন্দ্রিয়, যাহা আত্মগত কল্পনায় সুন্দর, তাহাতে তাঁহার তেমন দখল ছিল না; কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাতে যে রস ও যে সৌন্দর্য্য, দীনবন্ধু সেই রসের রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি।